সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিশেষ সংখ্যা

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি...

চিত্ররূপময় কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশ

উপরে: ০১. ৭ জানুয়ারি ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে বাংলাদেশের পানি সম্পদমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর কার্যালয়ে স্বাগত জানান; ০২. ১১ জানুয়ারি ইফাদ গ্রুপ ও ভারতের টিভিএস মোটর কোম্পানির অংশীদারিত্ব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার ও বাংলাদেশের নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খান; ০৩. ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় হাই কমিশনার; ০৪. বাংলাদেশে টাটা মোটরস-এর নতুন গাড়ি 'টিয়াগো'-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি হাই কমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা ও বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ

নিচে: ০১. ৩১ জানুয়ারি হাই কমিশনার বাংলাদেশে নবনিযুক্ত মিশরের মাননীয় রাষ্ট্রদূত ওয়ালিদ শামসেলদিনকে স্বাগত জানান; ০২. ৯ জানুয়ারি হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী নরেশ আনন্দকে শুভেচ্ছা জানান; ০৩. ২৪ জানুয়ারি হাই কমিশনার নেপালের রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক চপলাল ভূষাল ও শ্রীমতী পুষ্পা ভূষাল (এমপি)-কে স্বাগত জানান

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ০২ | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪ | ফেব্রুয়ারি ২০১৮

High Chommission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

ভ্রমণ
ভূস্বর্গ কাশ্মীর
পৃষ্ঠা: ২৮

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — হাই কমিশনারের রামগড় সফর
ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৮-১৯ ঘোষণা ০৪
ভারত ও ভুটানের ফরেন সার্ভিস প্রশিক্ষণার্থী অফিসারদের ৩ দিনের বাংলাদেশ ভ্রমণ ০৬
নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা... ০৭

উদ্‌যাপন — প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিনভর অনুষ্ঠানমালা ০৮

নিবন্ধ — ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ ০৯

প্রবন্ধ — ভাষা : অক্ষতপৃষ্ঠার পাঠ ॥ জামিরুল শরীফ ১১
সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি... ১৩
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ॥ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ১৮

কবিতা — শেলী সেনগুপ্তা ॥ এস এম তিতুমীর
তাহামিনা কোরাইশী ॥ মীম মাশকুর ২৪
বিমলকৃষ্ণ রায় ॥ সেহাঙ্গল বিপ্লব ॥ হাসান হাবিব ২৫

পৌরাণিকী — উপেক্ষিতা উর্মিলা ॥ হিমাদ্রিশেখর সরকার ২৬

ভ্রমণ — অপরূপ সৌন্দর্যের ভূস্বর্গ কাশ্মীর ॥ হাবিবুর রহমান স্বপন ২৮

স্মরণ — বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৩৩

শিক্ষা — ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ ৩৫

ছোটগল্প — দেবা ॥ নারায়ণ সাহা ৩৬

শিশুতীর্থ — হরিয়ানার লোককাহিনি: কৃষকের উপহার ৪০

বিশেষ রচনা — যেমন করে গাইছে আকাশ ॥ সালাম আজাদ ৪১

রাজ্য পরিচিতি — উত্তরাখণ্ড ৪৩

শেষ পাতা — সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪৮

একুশের সরণি বেয়ে...

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালি পলাশির কৃষ্ণচূড়াশোভিত প্রাঙ্গণে বুকের রক্ত বিসর্জন দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' আমরা সেই রক্তের কথা, পুলিশের হিংস্রতার কথা, পাকিস্তান সরকারের একচোখা নীতি আর বৈষম্যের কথা ভুলতে পারিনি। সেদিন রাজপথের কৃষ্ণচূড়ার ঝরা ফুলে সে-রক্ত মিশে এমন দাবানলের সৃষ্টি করেছিল যে, সে আগুনে পুড়ে বাঙালির আত্মপরিচয় আর জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দাবি নিখাদ হয়ে উঠেছিল। একুশের চেতনা থেকে, একুশের সরণি বেয়ে আমাদের মনে অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন আর প্রত্যয় জন্ম নিয়েছিল– তারই ফলে এল ৬ দফা দাবি, যাকে আমরা বলি বাঙালির মুক্তির সনদ, তারই পথ ধরে রমনার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান করে নেওয়া।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ০২ ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

সমৃদ্ধ করবে

ভারত ও বাংলাদেশের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ 'ভারত বিচিত্রা'র প্রতিটি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন এক জাদুর ছোঁয়া রয়েছে যে এটি একবার পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। আমার অনেক বড় প্রাপ্তির জায়গা এটি যে– *ভারত বিচিত্রা*র আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায় 'ভারতবিহার বৃত্তান্ত' এবং মার্চ-এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায় 'বাংলা সাহিত্যে নববর্ষ' শীর্ষক আমার লেখা প্রকাশিত হয়। ভারত বিচিত্রার গ্রাহক তালিকায় আমার নাম ও ঠিকানা অন্তর্ভুক্তি আমাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

মো. আল-আমিন
কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার
গাজীপুর-১৭০৫

আশা করি অগ্রাহ্য হবে না

অপেক্ষার প্রহর যেন ফুরোয় না, কবে *ভারত বিচিত্রা* আসবে। কখনো পোস্ট অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আবার কখনো পিয়নকে বিরক্ত করার যেন কমতি নেই। হঠাৎ পাঠাগারের দরজা খুলেই দেখা যায় চৌকাঠের ফাঁকা দিয়ে রাখা *ভারত বিচিত্রা*। পত্রিকাটি হাতে পেয়ে অধীর আগ্রহের অপেক্ষায় থাকা মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় ২০১৬-এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, জুন, জুলাই এই সংখ্যাগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। ইতোপূর্বেও আপনার বরাবরে অনুরোধ করেছিলাম সংখ্যাগুলো পাঠানোর জন্য। আবারও অনুরোধ করছি যদি এই সংখ্যাগুলো আপনাদের সংগ্রহে থাকে তাহলে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে চিরঋণী করবেন। অন্যদিকে *ভারত বিচিত্রা*র পৃষ্ঠা কেটে ইংরেজি ব্লক লেটারে ঠিকানা লিখে দ্রুত পাঠানোর কথা বলেছেন। আমরা এমন মূল্যবান পত্রিকাটির পৃষ্ঠা না কেটে পাঠাগারের প্যাডে ঠিকানা লিখে পাঠালাম। আশা করি, আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য হবে না।

নিরঞ্জন মিত্র
সভাপতি, শ্রী শ্রী হরি গুরুচাঁদ মিশন পাঠাগার
গ্রাম+ডাকঘর– উত্তর সোনাখালী
উপজেলা– মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর

সবিনয় নিবেদন

*ভারত বিচিত্রা*র প্রতি আপনার ভালবাসার তুলনা নেই– চিঠিটার ছত্রে ছত্রে আপনার ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে আমরাও আবেগাপ্লুত। আমাদের পক্ষে আপনার সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি পাঠানো সম্ভব নয়, তবে আপনি চাইলে ঢাকা এসে অতিরিক্ত কপি থাকলে সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ। – সম্পাদক

নিয়মিত পেতে চাই

আমার প্রিয় *ভারত বিচিত্রা* তার চুয়াল্লিশতম বর্ষ পার করছে। বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে আমি পত্রিকাটি পড়ে আসছি। পত্রিকাটি প্রথম যখন হাতে আসে তখন আমি স্কুলের ছাত্র। প্রায় চার দশক ধরে *ভারত বিচিত্রা*র সাথে আছি। এর অনেক পুরনো সংখ্যা আমার সংগ্রহে আছে। এর বিভিন্ন মননশীল প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা যেমন আমার মানসগঠনে সাহায্য করেছে, তেমনি এতে প্রকাশিত নানা সচিত্র ভ্রমণকাহিনি পড়ে আমি ভারত ভ্রমণের স্বাদ পেয়েছি। বহুদিন থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পত্রিকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিয়মিতভাবে পত্রিকাটি পড়া সম্ভব হচ্ছে না। বিগত ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমি *ভারত বিচিত্রা*র একজন অনিয়মিত লেখক। বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও পত্রিকাটির বিদগ্ধ সম্পাদকের বদান্যতায় পত্রিকাটি আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে গ্রাহক নিচ্ছে জানতে পেরে আনন্দিত হলাম। ডাকযোগে পত্রিকাটি আগামী সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিত পেতে আকুল আবেদন জানালাম।

হিমাদ্রিশেখর সরকার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
শ্যামলী শাখা, ঢাকা ১২০৭

ঘটনাপঞ্জি ❖ ফেব্রুয়ারি

সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক হুমায়ুন কবির

০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ ❖ কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের জন্ম
০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ ❖ ধ্রুপদী গায়ক পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম
০৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ ❖ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ ❖ সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের মৃত্যু
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ❖ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ ❖ লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর মৃত্যু
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ ❖ কবি রাজনীতিক সরোজিনী নাইডুর জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ ❖ লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ❖ দাদাসাহেব ফালকের মৃত্যু
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ ❖ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ ❖ *দেশ*-সম্পাদক সাগরময় ঘোষের মৃত্যু
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ❖ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ ❖ সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের জন্ম
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ ❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যু
২৩ ফেব্রুয়ারি ৯৮২ ❖ বৌদ্ধ দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ ❖ কথাকার লীলা মজুমদারের জন্ম

ফেব্রুয়ারি মাস এলেই হয়তো বাংলাদেশের বাঙালি বলেই একুশে ফেব্রুয়ারির কথা অবধারিতভাবে আমাদের মনে পড়ে সবার আগে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালি পলাশির কৃষ্ণচূড়াশোভিত প্রাঙ্গণে বুকের রক্ত বিসর্জন দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' আমরা সেই রক্তের কথা, পুলিশের হিংস্রতার কথা, পাকিস্তান সরকারের একচোখা নীতি আর বৈষম্যের কথা ভুলতে পারিনি। সেদিন রাজপথের কৃষ্ণচূড়ার ঝরা ফুলে সে-রক্ত মিশে এমন দাবানলের সৃষ্টি করেছিল যে, সে আগুনে পুড়ে বাঙালির আত্মপরিচয় আর জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দাবি নিখাদ হয়ে উঠেছিল। একুশের চেতনা থেকে, একুশের সরণি বেয়ে আমাদের মনে অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন আর প্রত্যয় জন্ম নিয়েছিল– তারই ফলে এল ৬ দফা দাবি, যাকে আমরা বলি বাঙালির মুক্তির সনদ, তারই পথ ধরে রমনার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান করে নেওয়া। একুশের শপথ থেকেই আজ আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। একুশের আলোকবর্তিকায় আজ বাঙালির বিশ্বযাত্রায় সামিল হওয়া। ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে, এ খবর এখন পুরনো। আমরা এখন দাবি তুলছি বাংলাকে জাতিসংঘে ব্যবহৃত অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের।

বাংলাদেশের বাঙালির এই অর্জন কিন্তু বিশ্বব্যাপী বাংলা ও বাঙালিকে আত্মগর্বে গর্বিত করে তুলেছে। তাই ভারতের বাংলাভাষী বিভিন্ন প্রদেশে, বিশ্বের সকল প্রান্তে বসবাসকারী বাঙালিরা ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করেন যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' এই কালজয়ী গানটি এখন মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ের গানে পরিণত হয়েছে। কত কত ভাষায় যে একুশের এই অমর গানটি গীত হচ্ছে তার ইয়াত্তা নেই!

আমাদের এক অকালপ্রয়াত কবি আপামর বাঙালির কবি হওয়ার প্রবণতাকে হয়তো ব্যঙ্গ করেই বলেছিলেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' এর চেয়ে সত্যি কথা আর হয় না। নিজের কথাটা যিনি সর্বজনের করে তুলতে পারেন, তিনি সার্থক কবি। সেজন্যই কবিকে আমরা ত্রিকালদর্শী বলি। সে কারণেই কবি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এ কারণে ভুলতে পারি না যে, তিনি নিজের কথাটা সর্বজনের করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর অনেক কবিতা, গান আর নাটকের শব্দবন্ধ কিংবা সংলাপ আমাদের প্রাণের উচ্চারণ হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রতিদিনের যাপিতজীবনে তিনি প্রায় অনিবার্য। বাংলাভাষায় আরেকজন কবির ভেতর আমরা এমন অমোঘ সব শব্দমালা পেয়েছি, যা চিরন্তনতার আভরণে মোড়া। এই কবিটি জীবদ্দশায় কবিখ্যাতি, সম্মান কিংবা পুরস্কার– কিছুই পাননি, কিন্তু গভীর আকুতি ছিল স্বীকৃতি পাওয়ার। এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে কলকাতার জনারণ্যে ট্রামের নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন এই অভিমানী কবি। অনেকে তাঁর মৃত্যুকে আত্মাহুতি বলেছেন পরবর্তীকালে। সেই অকালপ্রয়াত অমিত সম্ভাবনাময় কবি জীবনানন্দ দাশকে গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় স্মরণ করছি আমাদের এই ভাষার মাসে, ফেব্রুয়ারিকে তো তিনিও অবিস্মরণীয় করেছেন বাঙালির কাছে। এই মাসটি যে তাঁর জন্মদিনে ভাস্বর!

হাই কমিশনারের রামগড় সফর

ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা খাগড়াছড়ির জেলার রামগড়ে ফেনী নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতুর অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন।

ভারত সরকারের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক সহায়তায় প্রস্তাবিত সেতুটি নির্মিত হচ্ছে। এটি তৈরি করছে ন্যাশনাল হাইওয়েজ এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচআইডিসিএল)। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে সাব্রুম (ভারত)-রামগড় (বাংলাদেশ) সংযোগের মাধ্যমে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের পথ সুগম হবে। এছাড়াও ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও পর্যটন প্রসারের পাশাপাশি মানুষে মানুষে সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে গোটা অঞ্চলের উপকার সাধিত হবে।

ইতোমধ্যে সেতুর ভারতীয় অংশে পরীক্ষামূলক পাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে এবং অল্পদিনের মধ্যে বাংলাদেশের অংশেও শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২০ সাল নাগাদ সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

ত্রিপুরা সরকারের গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) সচিব শ্রী শান্তনুর নেতৃত্বে এনএইচআইডিসিএল ও পিডব্লিউডি-র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও মাননীয় মন্ত্রী এবং হাই কমিশনারের সঙ্গে সেতুর নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। এসময় শ্রী শান্তনু বিলোনিয়ার ছোটাখোলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত ভারত-বাংলা মৈত্রী উদ্যানের কথা উল্লেখ করেন। ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার এর উদ্বোধন করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

হাই কমিশনারের সারস্বতোৎসবে অংশগ্রহণ...

২২ জানুয়ারি ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জাতীয় সংসদের অ্যানেক্স ভবনে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজা উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় পূজাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও হাই কমিশনার শহরের দু'টি প্রধান পূজা মণ্ডপ– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ এবং অফিসার্স ক্লাবের সরস্বতী পূজা পরিদর্শন করেন। তিনি উপস্থিত ভক্তজন, শিক্ষার্থী ও বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পূজার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৮-১৯ ঘোষণা

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন সম্প্রতি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স (আইসিসিআর) শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা করেছে। একমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া অন্য সব বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনা করার জন্য মেধাবী বাংলাদেশী নাগরিকদের এই শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। ভারত সরকার এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ বাংলাদেশী নাগরিককে আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছে।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে (চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া) বিভিন্ন কোর্সে পড়াশোনা করার জন্য নিম্নলিখিত বৃত্তি স্কিমগুলো দেওয়া হয়েছে–

১. বাংলাদেশ বৃত্তি স্কিম (প্রকৌশলসহ স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের জন্য);
২. ভারত বৃত্তি স্কিম (প্রকৌশল ছাড়া স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের জন্য);

বৃত্তি পেতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং পাশকৃত পরীক্ষায়

কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর অথবা জিপিএ ৫-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করার জন্য https://a2ascholarships.iccr.gov.in এই ঠিকানায় নিজেদের ব্যক্তিগত লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিতে হবে। আবেদনকারীদের নির্দেশনাগুলো পড়ে অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদনের সময় আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

ক. যারা BE/B Tech. কোর্সের জন্য আবেদন করবেন তাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

খ. আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই জুলাই ২০১৮ এর মধ্যে ১৮ হতে হবে।

গ. সব শিক্ষার্থীকে হোস্টেলে থাকতে হবে। পরিবার ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কারণ ছাড়া বাইরে অবস্থান করা যাবে না।

অনলাইনে আবেদন জমা দেয়ার শেষ সময় ছিল ২০ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল ৫.০০টা। প্রার্থীদের ৩০ মিনিটের ইংরেজিতে দক্ষতা যাচাইয়ে অংশ নিতে হবে যার সময় ও স্থান জানিয়ে দেওয়া হয়।

বিস্তরিত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়:

শিক্ষা শাখা, ভারতীয় হাই কমিশন
১-৩ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা
ফোন: ৫৫০৬৭৩০-৫৫০৬৭৩০৮
এক্সটেনশন- ১০৯৬/১১১২।
ই-মেইল: edu1.dhaka@mea.gov.in

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশিপ স্কিম

চলতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক ও আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে ১০০০ করে মোট ২০০০ বৃত্তি দেওয়া হবে। আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এককালীন ৫০,০০০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এককালীন ২০,০০০ টাকা পাবেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। এতদ্‌সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) এবং ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ স্থানীয় *বাংলাদেশ প্রতিদিন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আবেদনকারীদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত ফরমে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-র আগে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ভারত সরকার গত পাঁচ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের মোট ১০,০০০ বৃত্তি প্রদান করেছে।

মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবাদান স্কিম

ভারত সরকার প্রতি বছর ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের নতুন স্কিম চালু করেছে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনির হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বাংলাদেশের সব জেলা থেকে অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের বাছাই করবে। এতদ্‌সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) এবং ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ স্থানীয় *বাংলাদেশ প্রতিদিন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আবেদনকারীদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত ফরমে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-র আগে আবেদন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ● বিজ্ঞপ্তি

শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান

১৬ জানুয়ারি ২০১৮ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি নোয়াপাড়ায় কিংবদন্তী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর বাসভবনে যান। শ্রী মুখোপাধ্যায়ের সম্মানে ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনার ও চট্টগ্রামের সহকারী হাই কমিশনার একাধিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত নেতাজির জন্মদিন পালন

২৩ জানুয়ারি ২০১৮ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এ মহৎ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত নেতাজির জন্মদিন পালিত হল

ভারত ও ভুটানের ফরেন সার্ভিস প্রশিক্ষণার্থী অফিসারদের ৩ দিনের বাংলাদেশ ভ্রমণ

২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতীয় ফরেন সার্ভিস ২০১৭ ব্যাচ এবং ভুটানের দুই প্রশিক্ষণার্থী অফিসারের বাংলাদেশে পরিচিতিমূলক ভ্রমণ উপলক্ষে স্বাগত জানান।

পরের দিন হাই কমিশনার পরিচিতিমূলক ভ্রমণে আসা ভারতীয় ফরেন সার্ভিস ২০১৭ ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের নিয়ে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতীয় উন্নয়ন সহায়তার আওতায় বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার রামকোলা উন্নয়ন প্রকল্পবিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করেন।

৩০ জানুয়ারি ভারত ও ভুটানের ফরেন সার্ভিস ২০১৭-র প্রশিক্ষণার্থী অফিসাররা ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। একই দিনে তাঁরা বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশী প্রশিক্ষণার্থী অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পরের দিন অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি তাঁরা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়

৪ জানুয়ারি, ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের সভাপতি ও সাংসদ নজিবুল বাশার মাইজভাণ্ডারী এবং বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের যুগ্ম-সচিব তৈয়বুল বাশার মাইজভাণ্ডারীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন

গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মোৎসবে ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতিনিধিত্ব

৫ জানুয়ারি ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুদুয়ারা নানক শাহী প্রাঙ্গণে ১০ম গুরু সাহিব শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংজীর ৩৫১তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন হাই কমিশনের প্রথম সচিব শ্রী গৌরব গান্ধী

হাই কমিশনারের কুমুদিনী কমপ্লেক্স পরিদর্শন

২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ হাই কমিশনার মির্জাপুরে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (কেডবিউটি)-এর কুমুদিনী হাসপাতাল, কুমুদিনী উইমেন মেডিকেল কলেজ, কুমুদিনী নার্সিংহোম, ভারতেশ্বরী হোমস পরিদর্শন করেন। ১৯৪৭ সালে শ্রী রণদাপ্রসাদ সাহা কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের যাবতীয় সম্পদ ট্রাস্টে দান করেন।

হাই কমিশনার কুমুদিনী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী রাজীব সাহাকে দাতব্য স্কুল, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে জনসেবার সর্বোচ্চ মানদণ্ড বজায় রেখে তার পিতামহ শ্রী রণদাপ্রসাদ সাহা ও '৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অপহৃত ও শহিদ পিতা শ্রী রবি সাহার উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখার জন্য আন্তরিক অভিবাদন জানান

নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা...

০১. ২ জানুয়ারি ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. এনামুল হক। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি আমাদের অভিন্ন শিল্প ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে কাজ করছেন

০২. ৮ জানুয়ারি, ২০১৮ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা কোস্টগার্ড সহায়তা বিষয়ে মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে বাংলাদেশে আসা ভারতীয় কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক শ্রী রাজেন্দ্র সিং ও প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান

০৩. ১০ জানুয়ারি ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী এস কে চৌধুরীর সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। শ্রী চৌধুরী বাংলাদেশ সফরকালে ভারত সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশের খুলনা-মংলা বন্দর এবং আখাউড়া-আগরতলা রেল লাইন প্রকল্প পরিদর্শন করেন

০৪. ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় সোসাইটি অফ এথনোফার্মাকোলজি-র ১৮তম এবং সোসাইটি অফ এথনোফার্মাকোলজি, ইন্ডিয়ার ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (আইএসই-এসএফই ২০১৮) হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। সম্মেলনে ১০০ জনের একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল ও ৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান

০৫. ২১ জানুয়ারি হাই কমিশনার শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশে নিযুক্ত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রী মনমোহন প্রকাশকে স্বাগত জানান

০৬. ২৩ জানুয়ারি হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ স্কাউটস্-এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস একটি মেগা ভারত-বাংলাদেশ ক্যাম্পের আয়োজন করছে যেখানে ভারতের ৪৫০ জন স্কাউট অংশ নেবে

০৭. ২৯ জানুয়ারি হাই কমিশনার এয়ার ইন্ডিয়া, ঢাকার কান্ট্রি ম্যানেজার শ্রী আর এস কোলি ও অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

০৮. ৩১ জানুয়ারি হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারত সরকারের 'এইড টু বাংলাদেশ' প্রোগ্রামের আওতায় জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার একটি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য স্থানীয় সাংসদ মাহজাবিন খালেদের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিনভর অনুষ্ঠানমালা

জানুয়ারি ২৬, ২০১৮ সকালে ভারতের ৬৯তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা পতাকা উত্তোলন করেন। পরে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করে শোনান হাই কমিশনার। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারত থেকে আগত বিশেষ নৌবাহিনি ব্যান্ড দল জাতীয় সংগীত এবং দেশাত্মবোধক সংগীতের সুর পরিবেশন করে। এরপর ঢাকায় বসবাসরত ভারতীয় শিশুরা এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যায় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকার বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এক হাজারেরও বেশি আমন্ত্রিত অতিথি ভারতীয় নেভি ব্যান্ড ও সুরের ধারার মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা উপভোগ করেন।

নিবন্ধ

ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ

ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ (আইপিআর) ভারতে অবস্থিত একটি স্বায়ত্তশাসিত পদার্থবিদ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্লাজমা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক যেমন মৌলিক প্লাজমা পদার্থবিদ্যা, চৌম্বকীয়ভাবে কেন্দ্রীভূত গরম প্লাজমার ওপর গবেষণা এবং শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্লাজমা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মত মৌলিক গবেষণায় নিয়োজিত। এটি ভারতের বৃহৎ এবং নেতৃস্থানীয় প্লাজমা পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠান। আইপিআর আন্তর্জাতিক ফিউশন এনার্জি উদ্যোগ আইটিইআর-এর ভারতীয় অংশীদার হিসেবে প্রধান বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ভূমিকা পালন করছে। এটি মহাকর্ষজ ঢেউ গবেষণায় ইন্ডিগো কনসোর্টিয়ামের অংশ।

১৯৮২ সালে ভারত সরকার চুম্বকীয়ভাবে কেন্দ্রীভূত উচ্চ তাপমাত্রার প্লাজমা গবেষণার জন্য প্লাজমা ফিজিক্স প্রোগ্রাম (পিপিপি)-এর সূচনা করে। ১৯৮৬ সালে পিপিপি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্লাজমা গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৯ সালে আদিত্যর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আইপিআর-এ পূর্ণাঙ্গ টোকাম্যাক পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে ১০০০ সেকেন্ড কর্মক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় প্রজন্মের অতিপরিবাহী স্থিতাবস্থা টোকাম্যাক– এসএসটি-১ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ গতিপ্রাপ্ত হয় এবং ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জির তত্ত্বাবধানে চলে আসে। ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাজমা টেকনোলজিস্ (এফসিআইপিটি) গঠনের পর শিল্পক্ষেত্রে প্লাজমা কর্মকাণ্ডের পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং ১৯৯৮ সালে গুজরাটের গান্ধীনগরে একটি আলাদা ক্যাম্পাসে তার যাত্রা শুরু করে।

গান্ধীনগর জেলার ভাট গ্রামে সবরমতী নদীর তীরে ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ অবস্থিত। এটির অবস্থান প্রায় আহমেদাবাদ ও গান্ধীনগরের মাঝামাঝি– আহমেদাবাদ বিমানবন্দর ও আহমেদাবাদ রেলওয়ে স্টেশন থেকে যথাক্রমে ৫ ও ১৪ কিলোমিটার দূরে।

ভারতে ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাজমা টেকনোলোজিস্ এবং সেন্টার ফর প্লাজমা ফিজিকস্– ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ (সিপিপি-আইপিআর) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান প্লাজমা গবেষণায় নিযুক্ত।

ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাজমা টেকনোলোজিস (এফসিআইপিটি)

প্লাজমা গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি বিভাগ হচ্ছে ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাজমা টেকনোলোজিস্ যা শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন প্লাজমা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে। প্লাজমা প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে শিল্পখাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্লাজমাভিত্তিক প্রযুক্তিসমূহের প্রসার, পরিচর্যা, উন্নয়ন, প্রদর্শন এবং স্থানান্তরের জন্য ১৯৯৭ সালে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রটি ইনস্টিটিউট ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। শিল্পক্ষেত্রে শিল্প প্রকল্পে কাজ করার কারণে এফসিআইপিটি এর গবেষণা ও উন্নয়ন-শক্তির যেমন উন্নতিসাধন করেছে, তেমনি শিল্পক্ষেত্রে কাজ করার সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।

এফসিআইপিটির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রাহকের মধ্যে আছে জনসন এন্ড জনসন, এএসপি ইথিকন আইএটি, ইউএসএ, ইউভিসিস্টেক জিএমবিএইচ জার্মানি, থার্মাঙ ইন্ডিয়া লিমিটেড, মহিন্দ্র এন্ড মহিন্দ্র লি., আইপিসিএল, লারসেন এন্ড টুবরো লি., এনএইচপিসি লি., জিই ইন্ডিয়া টেকনোলজি সেন্টার বাঙ্গালোর, বিএইচইএল, ট্রাইটন ভালভস্ লি., মহীশূর ইত্যাদির মত কোম্পানি এবং বিএআরসি, ডিআরডিও, আইএসআরও, আইআইটি খড়গপুর, ন্যাশনাল এয়ারোস্পেস ল্যাবরেটরিজ, অন্যান্য সিএসআইআর ল্যাব প্রভৃতির মত উল্লেখযোগ্য সংস্থা। এফসিআইপিটি-র অবকাঠামোর মধ্যে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ বস্তু সনাক্তকরণ পরীক্ষাগার যাতে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র, ইডিএএক্সসহ ফিল্ড ইমিশন স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র, অ্যাটমিক ফোর্স অণুবীক্ষণযন্ত্র, এক্স-রে ডিফ্রাক্টোমিটার, স্পেকট্রোস্কোপিক ইলিপসোমিটার, ইউভি-ভিআইএস স্পেকট্রোস্কোপি, সোলার সিমিউলেটর, পুরুত্ব মাপার প্রোফাইলোমিটার, ফেজ এনালাইজারসহ অপটিক্যাল মেটালুর্জিক্যাল অণুবীক্ষণযন্ত্র, পূর্ণাঙ্গ মেটালোগ্রাফি পরীক্ষাগার, ভিকার'স হার্ডনেস টেস্টার, এএসটিএম বি ১১৭ করোশন টেস্টিং সেটআপ প্রভৃতি। অন্যান্য অবকাঠামোর মধ্যে আছে ইলেকট্রনিক্স এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন পরীক্ষাগার, প্রসেস ডেমন্স্ট্রেশন সিস্টেম ইত্যাদি।

এফসিআইপিটি বর্জ্য থেকে জ্বালানি তৈরি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্লাজমা নাইট্রাইডিং ও প্লাজমা নাইট্রকার্বুরাইজিংয়ের মত পৃষ্ঠতল শক্ত করা এবং তাপ শুদ্ধ করার প্রযুক্তি, ম্যাগনেট্রনের ইতস্তত নিক্ষেপ ব্যবহার করে প্লাজমা-সহায়তাযুক্ত মেটালাইজেশন প্রযুক্তি, অবক্ষেপের ওপর কার্যকর কোটিংয়ের জন্য প্লাজমা-বর্ধিত সিভিডি, প্লাজমা স্মেলটিং ও মেল্টিং, প্লাজমা ডায়াগনস্টিকস্, মহাকাশ-সম্পর্কিত প্রযুক্তি ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে।

সম্প্রতি, আয়ন ইরেডিয়েশনজাত আংশিক পরিবাহী বস্তুসমূহ এবং এবড়োখেবড়ো কঠিন পদার্থের বিন্যাস গবেষণাজগতে ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়। এখন ন্যানোরিপল বা ন্যানোডটের মত বিভিন্ন বিন্যাস তৈরিতে ব্রডবিম আয়ন উৎস এবং প্লাজমোনিক গবেষণায় রূপার কোটিংয়ের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা হতে যাচ্ছে।

শিল্প কারখানাগুলি তাদের চুক্তিবদ্ধ গবেষণা, বিশেষায়িত প্লাজমা প্রোসেসিং যন্ত্রপাতি এবং শক্তি উৎস উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহারক্ষেত্র অনুসন্ধান, বস্তুর বৈশিষ্ট্যকরণ সার্ভিস প্রভৃতির জন্য এফসিআইপিটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে।

সেন্টার অফ প্লাজমা ফিজিকস্– ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ (সিপিপি-আইপিআর)

আজকের দিনে গবেষণার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে প্লাজমা ফিজিকস্কে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় নীতির আলোকে অসম সরকার ১৯৯১ সালে একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেন্টার অফ প্লাজমা ফিজিকস্ প্রতিষ্ঠা করে। উদ্দেশ্য ছিল প্লাজমা ফিজিকস্ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মৌলিক তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক গবেষণা পরিচালনা।

এটি অসম সরকারের শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। গুয়াহাটির দিসপুরের সপ্তশহিদ পথে একটি ভাড়া করা বাড়িতে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে এর যাত্রা শুরু হয়। দেশের ৪জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী– গান্ধীনগরের ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ, আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, মুম্বাইয়ের ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার এবং কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর চার প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে এর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত প্লাজমা বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রধীমান কৃষণ কউ (গান্ধীনগরের ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ-এর অধ্যাপক, মৃত্যু ২০১৭ সালের ১৮ জুন) পরিচালনা পর্ষদের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অধ্যাপক প্রধীমান কৃষণ এই কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখেন। তাঁর ৩-বছরের মেয়াদ শেষে শিক্ষা বিভাগ সেন্টারের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করেন এবং আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডিন অধ্যাপক এ সি দাসকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। দেশের বিশিষ্ট প্লাজমা বিজ্ঞানী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক সর্বেশ্বর বুজরবরুয়া ১৯৮৯ সালে বিক্রম সারাভাই গবেষণা পুরস্কার এবং ১৯৯৩ সালে কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত কয়েক বছরে সেন্টার নন্‌লিনিয়ার ফেনোমেনা, ইনস্টাবিলিটি, ডাস্টি প্লাজমার মত মৌলিক প্লাজমা প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করে এবং মৌলিক প্লাজমা ফিজিকস্ পরীক্ষা চালানোর জন্য একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থা (যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ এটমিক এনার্জি, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির মত প্রতিষ্ঠান)-র অর্থ সহায়তায় ডেন্স প্লাজমা ফোকাস এবং ডাস্টি প্লাজমার মত অগ্রগণ্য কয়েকটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নেয়। গত সাত বছরে কেন্দ্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সাময়িকীতে ৫০টির অধিক মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা গান্ধীনগরের ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ, আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, মুম্বাইয়ের ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার, ভুবনেশ্বরের রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিকস্, জাপানের কাইয়ুশু ইউনিভার্সিটি, জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ বেরিউথ, যুক্তরাজ্যের কুলহ্যাম ল্যাবরেটরি এবং অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডার্স ইউনিভার্সিটির মত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে চলেছেন। সেন্টার গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পিএইচডি কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। সেন্টারের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে প্লাজমা ফিজিকস্ এবং ফিজিক্যাল সায়েন্সের অন্যান্য শাখার ওপর বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা।

অসমের কামরূপের সোনাপুরে অবস্থিত সেন্টার অফ প্লাজমা ফিজিকস্, ইনস্টিটিউট ফর প্লাজমা রিসার্চ আইপিআর-এর একটি নতুন ক্যাম্পাসে পরিণত হয়। ২০০৯ সালের ২ মে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে আইপিআর-এর সঙ্গে একীভূত হয়। একীভূত সিপিপি-আইপিআর-এর নেতৃত্ব দেন সেন্টারের পরিচালক ড. কে এস গোস্বামী। আইপিআর-এর পরিচালকের নেতৃত্বে একটি পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এর বর্তমান ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সংখ্যা ১২। ১৪জন অন্যান্য কর্মচারী এবং অনেক রিসার্চ স্কলার ও প্রজেক্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে ক্যাম্প্যাসটি খুবই জমজমাট। আইপিআর-এর প্রধান কর্মসূচি হিসেবে মৌলিক প্লাজমা ফিজিকস্ ও কর্মসূচিমুখী ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় গবেষণা প্রশংসিত হচ্ছে।

গুয়াহাটি থেকে ৩২কিমি দূরে সোনাপুরের নাজিরাখাতে অবস্থিত এ ক্যাম্প্যাসটি বিভিন্ন জাতি ধর্ম ভাষার শান্তিপ্রিয় গ্রামীণ এক লোকালয়ে অবস্থিত– এ যেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক অনবদ্য সন্নিবেশ। নাজিরাখাত যেতে হয় ৩৭ নং জাতীয় মহাসড়ক থেকে পিডব্লিউডি-র রাস্তা ধরে। মহাসড়ক থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৮০০ মিটার। সবুজে মোড়া এই ক্যাম্পাসটির অবস্থান সোনাপুর বিমান ঘাঁটির কাছে।

সূত্র ইন্টারনেট • অনুবাদ মানসী চৌধুরী

প্রবন্ধ

ভাষা : অক্ষতপৃষ্ঠার পাঠ

জামিরুল শরীফ

মানুষের সীমানা আছে, কিন্তু তার বিকাশের সীমা নেই। যদিও শত প্রয়াস সত্ত্বেও সে একটা পরিমাণের বেশি পূর্ণতা লাভ করে না। কেবল ব্যক্তিগত বিকাশেই বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। এই বৈচিত্র্যের ধারক যেখানেই জন্মাক, তিনি বিশ্বনাগরিক। এই বৈচিত্র্য ও ভাবের সন্ধানে নেমে কবে যে তার চমক ভাঙল, কালসংজ্ঞা জানা নেই। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল তার সামনে বিস্তৃত জগতের দ্বার খোলা। তার বিকাশ ও প্রকাশ সর্বতোমুখ। স্পন্দিত হৃদয়ে একটা অভাবনীয় মন্ত্রণা ও স্বস্তি অনুভব। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সেখানে বহিরাশ্রয়ী, আর চৈতন্যের অনুভবে অসামান্য উপলব্ধির প্রকাশ তা অন্তরাশ্রয়ী। কোন অতীতের পরপার থেকে তার মনের কূলে ভেসে এল অজানা অস্পষ্ট কোন অনুচ্চারিত বাণী। চোখের সামনে তার প্রকৃতির অকৃপণ অক্ষতপৃষ্ঠার পাঠ। তার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য অংশ তার ভাষা, যা শব্দমাধ্যমে তার প্রয়োজনসিদ্ধির মুখ্য হেতু বটে, কিন্তু মানুষ সে, ভাষার সংযোগে তার ভাবনা-বেদনা মোটের ওপর অভিজ্ঞতা প্রকাশের দৃষ্টান্ত, এমনকি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই ঘটে চলেছে এক আশ্চর্য, অনাদিকাল অন্তর্গূঢ় ভাবের বিনিময়, নিঃশব্দে, অসংকোচে, অবারিত আত্মনিবেদনে। কোন সে প্রাগৈতিহাসিকে মানুষ সৃষ্টি করেছিল বিশ্বপ্রকৃতির বিস্ময়কে প্রকাশ করার জন্য ভাষার ঐশ্বর্য। আজ সেই বিস্ময়, সেই রহস্য, সেই বিদেহী অনুভূতি উন্মোচনে ভাষা হয়ে উঠল মানুষের কাছে পাথরের দেয়ালের মতো দুর্ভেদ্য। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রতিভায় মানুষ দুরূহকে অতিক্রম করে গেছে তার আত্মপ্রকাশের, কী অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার গরজে।

মানুষ তো বটেই, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি জীবিত প্রাণীমাত্রেই পরস্পর ভাবাভাবের সেতুবন্ধে শব্দ বিনিময় করে। স্বজাতিদের মধ্যে বিনিময় করে এক ধরনের শব্দায়িত সংকেত। এই শব্দ সংকেত তার মানসিক অবস্থার স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রতিধ্বনি– এরই নাম ভাষা। তর্কের অবকাশ রইল না যে আবেগের সঙ্গে ধ্বনির সংমিশ্রণেই ভাষার উৎপত্তি। ইতর প্রাণীর কথা জানি না, বুদ্ধির সিদ্ধান্তে মানি, মানুষের বেলায় প্রথমে এসেছিল বোবাদের মত শলাপরামর্শের ইশারা, অঙ্গভঙ্গি, অভিনয়, শরীর সংকেত। স্পর্শকাতর মনকে এই জাতীয় দৃশ্যসংকেত থেকে শ্রব্য-সংকেতে পৌঁছতে অনেক সময় লেগেছিল। কমিউনিকেশনের এই শব্দতরঙ্গে তার দৌড় শ্রবণসর্বস্ব, অর্থাৎ কান পর্যন্তই। এর বেশি দূরভাষণ সম্ভব হয়নি। মুখের ভাষা সেদিন দেশ ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে পারেনি। পরে ভাষার লিখিত রূপ সেই অর্থে কালজয়ী। উপমার মায়া কাটিয়ে শব্দ সমষ্টি, আভাস-সংকেত সুচিন্তায় বিন্যস্ত এবং অর্থসঙ্গত কথামালা। অন্য শব্দরূপ, যেমন ধাতু-নিসর্গ নিষ্পন্ন শব্দের মতই কথাশব্দও শ্রব্য, অর্থাৎ চোখে দেখা যায় না, কেবল কানে পৌঁছয়, হয়তো মনেও। এই কথাশব্দকে মানুষ কথাচিত্রে অবয়ব দিয়েছে বর্ণমালার মাধ্যমে। ভাষা সেদিন থেকেই প্রার্থিত স্থায়িত্ব পেল এবং মুখের কথা দেশ ও কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে তার দিগন্ত প্রসারিত হল আরেক দিগন্তে। মানুষের সভ্যতায় ভাষাই তাকে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছে। তার অন্তরাত্মার স্বগত অনুভূতির সাক্ষরে ভাষা হয়ে উঠেছে দেশ-কালের অখণ্ড পরিচয়, তার স্মৃতি, তার সংগ্রাম, ইতিহাস, তার ঐতিহ্য। এই ভাষায় কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়েছি, স্বপ্নে হয়েছি বিভোর, জেগেছি। শব্দ-ধ্বনির প্রাধান্যে নিরবধিকাল চেতনায় মিশে আছে সে মাতৃভাষা, বিশেষত আমার মাতৃভাষা, বাঙালির ভাষা, বাংলা ভাষা। আমার স্থানমাহাত্মে, আমার জাতিস্বাতন্ত্রের বিশিষ্টতা ধরা আছে এই মাতৃ ভাষার আধারেই। স্বগত অনুভূতির সাক্ষরে, আত্মগৌরবে বিশ্বমানবের স্বরূপ আমি।

বিশ্বমানবতার কবি, ঔচিত্যবোধের শ্রেষ্ঠসাধক এবং বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঋদ্ধি এবং সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের শীর্ষদেশ স্পর্শী প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রনাথে। ইউরোপে গ্যেটে যেমন সংস্কৃতির সামগ্রিকতার প্রতীক, প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথও তেমনি। এবং কালগত সামান্যকরণ বহু পূর্বেই অতিক্রমণে আজ আমরা নিঃসংশয় যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি সচেতন ও শিক্ষিত বাঙালির মানস প্রতিমূর্তি, আর সর্বগ্রাহ্য বাঙালির সার্বভৌম অভিব্যাপ্তি ও অধিকার এবং জাত্যাভিমানের জন্ম দিয়েছেন আরেক কৃতী বাঙালি, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস নির্মাণের উজ্জীবনে আছে তার মাতৃভাষা, আছে পূর্বসূরীদের ঐকান্তিক শ্রম ও মেধার ঈর্ষণীয় অবদান এবং কীর্তি। আছে রাজপথে একের পর এক আন্দোলন, জীবনপণ লড়াই, আত্মাহুতির সগৌরব ইতিহাস। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সারিতে বসার যোগ্য ও জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, ইতিহাস তার উত্তরাধিকার পৃথিবীর আর ক'টি ভাষার আছে? কিন্তু মনে রাখতে হবে ভাবালুতা কেবল ভাবুকের পক্ষেই সহজ। সাম্প্রতিককালে অতিমাত্রিক কল্পনাবিলাসের যথেচ্ছাচার থেকে মুক্ত রাখতে হবে ভাষাকে। জীবনের মত ভাষাকেও একেক সময় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কেবল সাহিত্যের জোরে ভাষা টিকে থাকে না। মনে রাখতে হবে ভাষার কোন পাখা নেই, সে শূন্যে বাতাসে উড়তে অক্ষম। ভাষার নির্ভর কোন জীবিত মানুষের কণ্ঠে, মস্তিষ্কে এবং লেখার ক্ষমতার উপরে। প্রমথ চৌধুরীর উদ্ধৃতি স্মর্তব্য– 'কেবল বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকাও ভালো, কারণ পৃথিবীতে আঙ্গুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার-পরিচ্ছদ, গৃহ-মন্দির– সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে।' মানে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন বৃত্তির বিকল্প নেই। প্রচুর অধ্যবসায় ব্যতীত সে বৃত্তি অর্জন অসম্ভব।

মনের স্বাভাবিক বিকাশের উৎস-মুখ বন্ধ করে, নতুন বিদ্যা-চিন্তার সঙ্গে তার নিজের জীবনের প্রাত্যহিক দ্বন্দ্বের পথ আগলবদ্ধ করে, তার নিজস্বতা ও মৌলিকতার পথ রুদ্ধ করে মানুষের বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ সম্ভব নয়। নিরবধিকালের আবেদন সত্ত্বেও বর্তমানের সংক্ষিপ্ত সীমায় সে আবদ্ধ হয়ে পড়লে কালস্রোতের ভেলা অপঘাতে আটকে পড়তে বাধ্য। খামখেয়ালী শিশুসুলভ স্বেচ্ছাচারে শুধু আঁকড়ে থাকলে তার মুক্তি নেই। আজ সাধারণ্যে অশিক্ষা, মেধার অপচয় আর অজ্ঞতার উপদ্রব খুব বেশি পরিমাণে চোখে পড়ে। মনে রাখতে হবে সভ্যতা ও প্রগতি মানুষের ভাষা, শিক্ষা ও উদ্ভূত চৈতন্যের মুখাপেক্ষী এবং দৈবক্রমে প্রকৃতির অকৃপণ অক্ষতপৃষ্ঠার পাঠ তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও উপায়।

জামিরুল শরীফ
প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক

জন্ম: ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৮৯৯ (ফাল্গুন ৬, ১৩০৫) ॥ মৃত্যু: অক্টোবর ২২, ১৯৫৪ (কার্তিক ৫, ১৩৬১)

প্রবন্ধ

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি...

চিত্ররূপময় কবিতার কবি জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ দাশ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি, লেখক, প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক। তাকে বাংলা ভাষার 'শুদ্ধতম কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের একজন। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এবং ১৯৯৯ সালে যখন তার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ সালে অকালমৃত্যুর আগে তিনি নিভৃতে ২১টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন যার একটিও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অনপনেয়ভাবে বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার প্রধান কবি হিসেবে তিনি সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত।

জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্গত বরিশাল শহরে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অধিবাসী। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাশগুপ্ত (১৮৩৮-৮৫) বিক্রমপুর থেকে বরিশালে বসবাস শুরু করেন। সর্বানন্দ দাশগুপ্ত পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন।

তিনি বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন এবং মানবহিতৈষী কাজের জন্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হন। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। সত্যানন্দ দাশগুপ্ত (১৮৬৩-১৯৪২) ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন গৃহবধূ কিন্তু তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর সুপরিচিত কবিতা 'আদর্শ ছেলে' (আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড়ো হবে) আজও শিশুশ্রেণির পাঠ্য। জীবনানন্দ ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান; তাঁর ডাকনাম ছিল মিলু। তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ এবং বোন সুচরিতা দাশ যথাক্রমে ১৯০৮ ও ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কম বয়সে স্কুলে ভর্তি করার বিরোধী ছিলেন বলে বাড়িতে মায়ের কাছেই মিলুর বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত। ভোরে পিতার কণ্ঠে উপনিষদ আবৃত্তি ও মায়ের গান শুনে তাঁর ঘুম ভাঙত। লাজুক স্বভাবের হলেও তাঁর খেলাধূলা, বাগান করা, ভ্রমণ ও সাঁতারের অভ্যাস ছিল। ছেলেবেলায় মামার সঙ্গে বহু জায়গায় বেড়িয়েছেন। শৈশবে একবার কঠিন অসুখে পড়েন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে মা ও মাতামহ হাসির গানের কবি চন্দ্রনাথের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।

১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে আট বছরের মিলুকে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীনই তাঁর বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় রচনার সূচনা হয়। এছাড়া সে সময় তাঁর ছবি আঁকার দিকেও ঝোঁক ছিল। ১৯১৫ সালে ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমানে মাধ্যমিক বা এসএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।। দু'বছর পর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় পূর্বের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটান; তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার উদ্দেশ্যে বরিশাল ত্যাগ করেন। ১৯১৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। এ বছরেই *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটির নাম ছিল 'বর্ষ আবাহন'। কবিতাটিতে কবির নাম ছাপা হয়নি, কেবল সম্মানসূচক শ্রী কথাটি লেখা ছিল। তবে পত্রিকার বর্ষশেষের নির্ঘণ্ট সূচিতে তার পূর্ণ নাম ছাপা হয়: শ্রীজীবনানন্দ দাশ, বিএ। সে সময়ে তিনি হ্যারিসন রোডের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে থাকতেন, তবে পরীক্ষার ঠিক আগে রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ায় তার প্রস্তুতি বাধাগ্রস্ত করে। এর দু'বছর পর ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি আইন পড়া শুরু করেন। ১৯২২ সালে কলকাতার সিটি কলেজে টিউটর হিসেবে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং আইন অধ্যয়ন ছেড়ে দেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনানন্দের কবি প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। ১৯২৫-এর জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুবরণ করলে জীবনানন্দ তাঁর স্মরণে 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামে একটি ব্রহ্মবাদী কবিতা রচনা করেন, যা *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরবর্তীকালে তাঁর প্রথম কাব্য সংকলন *ঝরা পালক*-এ স্থান পায়। কবিতাটি পড়ে কবি কালিদাস রায় মন্তব্য করেছিলেন, 'এ ব্রহ্মবাদী কবিতাটি নিশ্চয়ই কোন প্রতিষ্ঠিত কবির ছদ্মনামের রচনা।' ১৯২৫ সালেই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ স্বর্গীয় 'কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার পরপর তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই *কল্লোল* পত্রিকায় 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তা অনেক তরুণ কাব্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধীরে ধীরে কলকাতা, ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হতে থাকে; যেগুলির মধ্যে ছিল সে সময়কার বিখ্যাত পত্রিকা *কল্লোল, কালি ও কলম, প্রগতি* প্রভৃতি। ১৯২৭ সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক প্রকাশিত হয়। সে সময় থেকেই তিনি তাঁর পারিবারিক উপাধি 'দাশগুপ্তের' বদলে কেবল 'দাশ' লিখতে শুরু করেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কয়েক মাসের মাথায় তিনি সিটি কলেজের চাকরিটি হারান। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে কলেজটিতে ছাত্র অসন্তোষ দেখা দেয়, ফলে কলেজটির ছাত্রভর্তির হার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। জীবনানন্দ ছিলেন কলেজটির শিক্ষকদের মধ্যে কনিষ্ঠতম, তাই আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত কলেজ প্রথমে তাঁকেই চাকরিচ্যুত করে। এই চাকরিচ্যুতি দীর্ঘকাল জীবনানন্দের মনোবেদনার কারণ ছিল। কলকাতার সাহিত্যচক্রেও সে-সময় তাঁর কবিতা কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সে সময়কার প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক কবি-সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস *শনিবারের চিঠি*তে তাঁর রচনার নির্দয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। কলকাতায় করবার মত কোন কাজ ছিল না বলে কবি অধুনা বাংলাদেশের ছোট্ট শহর বাগেরহাটের প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে মাত্র দুই মাস কুড়ি দিন পরেই তিনি কলকাতায় ফিরে যান। চাকরি না থাকায় এ সময় তিনি চরম আর্থিক দুর্দশায় পড়ে যান। জীবনধারণের জন্যে তিনি গৃহশিক্ষকতার কাজ করতেন। এসময় লেখালিখি থেকে সামান্য কিছু রোজগার হত। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সন্ধান করছিলেন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এখানেও তাঁর চাকরির মেয়াদ মাত্র চার মাস।

১৯৩০ সালের ৯ মে (২৬ বৈশাখ, ১৩৩৭) তিনি রোহিণীকুমার গুপ্তের কন্যা লাবণ্য গুপ্তর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ে হয়েছিল ঢাকা শহরে পুরনো ঢাকার পাটুয়াটুলীর ব্রাহ্ম সমাজের রামমোহন লাইব্রেরিতে। লাবণ্য গুপ্ত সে সময় ঢাকার ইডেন কলেজে লেখাপড়া করছিলেন। জীবনানন্দ দাশের বিয়েতে কবি বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের পর আর তিনি দিল্লিতে ফিরে যাননি। এরপর প্রায় বছর পাঁচেক জীবনানন্দ কর্মহীন অবস্থায় ছিলেন। মাঝে কিছুদিন একটি বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন; ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যবসা করেছেন; কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হয়নি। এসময় তাঁর বাবা জীবিত এবং জীবনানন্দের স্ত্রী বরিশালেই ছিলেন বলে জীবনানন্দের বেকারত্ব পারিবারিক দুরবস্থার কারণ হয়নি।

১৯৩১ সালে কবির প্রথম সন্তান মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়। প্রায় সে সময়েই তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সাহিত্য সমাজে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়। কবিতাটির আপাত বিষয়বস্তু ছিল জোছনা রাতে হরিণ শিকার। অনেকেই এই কবিতাটি পাঠ করে তা অশ্লীল হিসেবে চিহ্নিত করেন। বেকারত্ব, সংগ্রাম ও হতাশার এই সময়কালে তিনি বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন; তবে তাঁর জীবদ্দশায় সেগুলো প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩৪ সালে তিনি একগুচ্ছ গীতিকবিতা রচনা করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর *রূপসী বাংলা* কাব্যের প্রধান অংশ নির্মাণ করে। এ কবিতাগুলিও জীবনানন্দ প্রকাশ করেননি। ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বোন সুচরিতা দাশ এবং *ময়ূখ* পত্রিকাখ্যাত কবি ভূমেন্দ্র গুহ কবিতাগুলো একত্রিত করে ১৯৫৭ সালে *রূপসী বাংলা* নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

যাহোক, ১৯৩৫ সালে জীবনানন্দ তাঁর পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রজমোহন কলেজে ফিরে যান। এটি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। তিনি সেখানকার ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। সে সময়ে কলকাতায় বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সমর সেন *কবিতা* নামে একটি আনকোরা নতুন কবিতা পত্রিকা বের করার তোড়জোড় করছিলেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই জীবনানন্দের একটি কবিতা স্থান পায়, যার নাম ছিল 'মৃত্যুর আগে'। কবিতাটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেবকে লেখা একটি চিঠিতে কবিতাটিকে 'চিত্ররূপময়' বলে মন্তব্য করেন। *কবিতা* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ ১৩৪২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৪/জানুয়ারি ১৯৩৫) তাঁর কিংবদন্তিতুল্য 'বনলতা সেন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৮ লাইনের এই কবিতাটি বর্তমানে বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতার অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। পরের বছর জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ এর মধ্যেই বরিশালে সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর পুত্র সমরানন্দের জন্ম হয়। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সংকলিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি স্থান পায়। ১৯৩৯ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় আবু সয়ীদ

আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়– এতে জীবনানন্দের চারটি কবিতা– 'পাখিরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন' এবং 'নগ্ন নির্জন হাত' অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪২ সালে কবির পিতৃবিয়োগ হয় এবং ঐ বছরেই তার তৃতীয় কবিতাগ্রন্থ *বনলতা সেন* প্রকাশিত হয়। বইটি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবন হতে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ষোল। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন জীবনানন্দের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর সম্পাদিত *কবিতা*পত্রিকায় জীবনানন্দের বহু কবিতা ছাপা হয়। ১৯৪৪ সালে তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *মহাপৃথিবী* প্রকাশিত হয়। এর আগের তিনটি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে নিজের পয়সায় প্রকাশ করতে হয়েছিল, তবে *মহাপৃথিবী*র জন্যে তিনি প্রকাশক পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন প্রকাশিত এই কবিতাগুচ্ছে যুদ্ধের ছাপ ছিল স্পষ্ট।

চাকরির প্রয়োজনে বরিশালে ফিরলেও কলকাতা জীবনানন্দকে খুব টানত। কলকাতার সুবিস্তৃত পরিসর তিনি উপভোগ করতেন। তিনি সবসময় কলকাতায় ফেরার কথা ভাবতেন এবং সুযোগ পেলেই স্টিমারে বরিশাল থেকে খুলনা, তারপর ট্রেনে বেনাপোল হয়ে কলকাতায় পাড়ি জমাতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান। এর ফলে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, কারণ এর পূর্বাংশ ছিল মুসলমানপ্রধান আর পশ্চিমাংশে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগুরু। ১৯৪৭-এর দেশভাগ পূর্ববর্তীসময়ে বাংলায় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। জীবনানন্দ সবসময়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। কলকাতায় ১৯৪৬ সালে যখন আবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, কবি '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি লেখেন। দেশবিভাগের কিছু আগে তিনি বিএম কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ছুটি বাড়িয়ে কলকাতায় দীর্ঘ কয়েক মাস অবস্থান করেন। এরপর পূর্ববঙ্গে আসেন কিন্তু তা ছিল সাময়িক। ১৯৪৭-এ দেশভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

কলকাতায় তিনি দৈনিক *স্বরাজ* পত্রিকার রোববারের সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা করেন কিন্তু এই চাকরির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র সাতমাস। কাজী নজরুল ইসলামবিষয়ক একটি গদ্য রচনা মালিকপক্ষের মনঃপুত না-হওয়ায় এই চাকরিচ্যুতি।

১৯৪৮ সালে তিনি *মাল্যবান* ও *সুতীর্থ* নামে দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে আগেরগুলোর মত এ দুটিও অপ্রকাশিত ছিল। এ বছরের ডিসেম্বরে তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ *সাতটি তারার তিমির* প্রকাশিত হয়। একই মাসে কলকাতায় তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশের জীবনাবসান ঘটে।

ইতোমধ্যে জীবনানন্দ কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে নিজস্ব একটি অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। তিনি 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র' নামে একটি সংস্থার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই সংস্থার মুখপত্র *দ্বন্দ্ব* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন। মাঝে তিনি কিছুকাল খড়গপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫২ সালে তাঁর জনপ্রিয় কবিতার বই *বনলতা সেন* সিগনেট প্রেস থেকে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। বইটি পাঠকানুকূল্য লাভ করে এবং নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন-ঘোষিত 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার' জয় করে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনার চাকরি জুটে গেলে তাঁর কলকাতাজীবনের অপরিসীম দৈন্যদশার সুরাহা হয়। ১৯৫৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবন আদৌ মসৃণ ছিল না। চাকরি তথা সুস্থির জীবিকার অভাব তাঁকে আমৃত্যু কষ্ট দিয়েছে। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। স্ত্রী লাবণ্য দাশ স্কুলে শিক্ষকতা করে জীবিকার অভাব কিছুটা পুষিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে অকালমৃত্যুর সময় তিনি হাওড়া গার্লস কলেজে কর্মরত ছিলেন। দুই দফা দীর্ঘ বেকার জীবনে তিনি ইন্সুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন এবং প্রধানত গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসায়ের চেষ্টাও করেছিলেন বছরখানেক। দারিদ্র্য এবং অনটন ছিল তার কর্মজীবনের ছায়াসঙ্গী।

সাহিত্যিক জীবন

সম্ভবত মা কুসুমকুমারী দাশের প্রভাবে তিনি ছেলেবেলায় পদ্য লিখতে শুরু করেন। ১৯১৯ সালে 'বর্ষ আবাহন' নামে তাঁর লেখা প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে 'শ্রী' বর্জন করে তিনি জীবনানন্দ দাশ নামে লিখতে শুরু করেন। দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত *কল্লোল* পত্রিকায় ১৩৩২ (১৯২৬ খ্রি.) ফাল্গুন সংখ্যায় 'নীলিমা' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার ভুবনে তাঁর আগমন ঘটে। জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত *ঝরা পালক* শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রকৃত কবিত্বশক্তি ফুটে ওঠেনি বরং এতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকট প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। তবে দ্রুত তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেন। দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্য সংকলন *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে তাঁর স্বকীয় কাব্যকৌশল পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। তাঁর শেষের দিককার কবিতা ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। *সাতটি তারার তিমির* প্রকাশিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ওঠে। নিজের কবিতার অবমূল্যায়ন নিয়ে জীবনানন্দ খুব ভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীয় রচনার অর্থায়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যদিও শেষাবধি তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কবি নিজেই নিজ রচনার কড়া সমালোচক ছিলেন। তাই সাড়ে আটশোর বেশি কবিতা লিখলেও তিনি জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও কাব্যসংকলনে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন। এমনকি *রূপসী বাংলা*র সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি তোরঙ্গে মজুদ থাকলেও তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি জীবনানন্দ দাশ। তবে তিনি এ কাব্যগ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন *বাংলার ত্রস্ত নীলিমা* যা তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত এবং *রূপসী বাংলা* প্রচ্ছদনামে প্রকাশিত হয়। আরেকটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় মৃত্যু পরবর্তীকালে যা *বেলা অবেলা কালবেলা* নামে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল কবি। অর্থের প্রয়োজনে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রকাশও করেছিলেন। তবে নিভৃতে গল্প এবং উপন্যাস লিখেছিলেন প্রচুর যার একটিও প্রকাশের ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া ষাট-পঁয়ষট্টিটিরও বেশি খাতায় 'লিটেরেরি নোটস' লিখেছিলেন যার অধিকাংশ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি।

কথাসাহিত্য

জীবদ্দশায় কথাসাহিত্যিক হিসেবে জীবনানন্দের কোনও পরিচিতি ছিল না। ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ২১ এবং ছোটগল্পের সংখ্যা শতাধিক। তিনি সম্পূর্ণ নিভৃতে উপন্যাস-ছোটগল্প লিখেছিলেন এবং জীবদ্দশায় একটিও প্রকাশ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর উপন্যাস-গল্পের পাণ্ডুলিপির খাতাগুলো আবিষ্কৃত হয়। কবিতায় যেমনি, কথাসাহিত্যেও তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে আলাদা, তাঁর সমসাময়িকদের থেকেও তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর গল্প-উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের ভিত লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাই বলে এই রচনাগুলো আত্মজৈবনিক নয়। তার সর্বাধিক পরিচিত উপন্যাস *মাল্যবান*, তবে *মাল্যবান* তাঁর প্রথম উপন্যাস নয়।

প্রবন্ধ

জীবনানন্দ দাশের প্রাবন্ধিক পরিচয় অদ্যাবধি বিশেষ কোন মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়নি। তবে তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ সমালোচনা লিখেছিলেন যার প্রতিটি অত্যন্ত মৌলিক চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর প্রবন্ধের সংকলন *কবিতার কথা* বেরিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর– ১৯৫৫ সালে। এতে তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত পনেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি বহুল পঠিত। এই বিখ্যাত পনেরটি প্রবন্ধের বাইরেও জীবনানন্দের আরো কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ সমালোচনা রয়েছে। এই রচনাসমষ্টির সংখ্যা খুব বেশি নয়। হিসেব করলে দেখা যায় তাঁর সাহিত্য-সমাজ-শিক্ষাবিষয়ক রচনার সংখ্যা ৩০, গ্রন্থভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা জাতীয় রচনার সংখ্যা ৯, স্মৃতিতর্পণমূলক রচনার সংখ্যা ৩ এবং বিবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা ৭। তদুপরি আরো ৭টি খসড়া প্রবন্ধের হদিশ করা গেছে।

বুদ্ধদেব বসু *কবিতা* পত্রিকার একটি প্রবন্ধ সংখ্যার (১৩৪৫,

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

বৈশাখ) পরিকল্পনা করেছিলেন মূলত কবিদের গদ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে। এরই সূত্রে জীবনানন্দ তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন যার নাম 'কবিতার কথা'। এ প্রবন্ধের শুরু এই ভাবে– 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি কেন-না তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে, এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।'

তাঁর গদ্য ভাষারীতিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রারম্ভিক বাক্যটি হ্রস্ব হলেও অব্যবহিত পরেই তিনি দীর্ঘ বাক্যের ঘন বুনোট গড়ে তুলেছেন। 'এবং', 'ও' ইত্যাদি অন্বয়মূলক পদ এবং 'কমা', 'সেমিকোলন', 'ড্যাশ' প্রভৃতি যতিচিহ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এমন একটি গদ্যভাষা যার সঙ্গে সমকালীন বাঙালি লেখক-পাঠকের আদৌ পরিচয় ছিল না। বস্তুত তাঁর প্রবন্ধগুলোর বাক্য গঠনরীতি সমসাময়িককালে সুপরিচিত ছিল না। এমনকী মনোযোগী পাঠকের কাছেও তা জটিল প্রতীয়মান হতে পারে। জীবনানন্দের অধিকাংশ গদ্য রচনাই ফরমায়েশী। সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, এই তিনটি পরিক্ষেত্রে জীবনানন্দ প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো লিখেছেন। তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম এরকম– 'কবিতার কথা', 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা', 'মাত্রাচেতনা', 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য', 'কবিতার আত্মা ও শরীর', 'কি হিসাবে কবিতা শাশ্বত', 'কবিতাপাঠ', 'দেশকাল ও কবিতা', 'সত্যবিশ্বাস ও কবিতা', 'রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা', 'কবিতার আলোচনা', 'আধুনিক কবিতা', 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ', 'কেন লিখি', 'রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র', 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা', 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', 'পৃথিবী ও সময়', 'যুক্তি, জিজ্ঞাসা ও বাঙালি', 'অর্থনৈতিক দিক', 'শিক্ষা ও ইংরেজি', 'শিক্ষা-দীক্ষা-শিক্ষকতা', 'শিক্ষার কথা', 'শিক্ষা সাহিত্যে ইংরেজি' এবং 'শিক্ষা-দীক্ষা'। সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ যে-সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ উপহার দিয়েছেন, তার প্রতিটি রচনাই বহুমাত্রিক মৌলিক চিন্তাসূত্রের স্বাক্ষর বহন করে।

স্বীকৃতি ও সমালোচনা

জীবদ্দশায় অসাধারণ কবি হিসেবে পরিচিতি থাকলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। এর জন্য তার প্রচারবিমুখতাও দায়ী; তিনি ছিলেন বিবরবাসী মানুষ। তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার পথিকৃতদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাঁর জীবন ও কবিতার ওপর বাংলায় প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এর বাইরে ইংরেজিতে *আ পোয়েট আপার্ট* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন ক্লিনটন বি সিলি। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসিসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি যদিও কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে এখন অবধি তাঁর যে বিপুল পাণ্ডুলিপিরাশি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ১৪টি উপন্যাস এবং শতাধিক গল্প।

মৃত্যু

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর কলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। ট্রামের ক্যাচারে আটকে তাঁর শরীর থেঁতলে গিয়েছিল। ভেঙে গিয়েছিল কণ্ঠা, উরু এবং পাঁজরের হাড়। গুরুতর আহত জীবনানন্দের চিৎকার শুনে নিকটস্থ চায়ের দোকানের মালিক চূণীলাল এবং অন্যরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ সময় ডা. ভূমেন্দ্র গুহসহ অনেক তরুণ কবি জীবনানন্দের সুচিকিৎসার

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কবি-সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় কবিকে দেখতে আসেন এবং আহত কবির সুচিকিৎসার নির্দেশ দেন যদিও তাতে চিকিৎসার তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। তাঁর অবস্থা ক্রমশ জটিল হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন কবি। চিকিৎসক ও সেবিকাদের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল প্রমাণিত করে ২২ অক্টোবর (১৯৫৪) রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল মান্নান সৈয়দসহ অনেকের ধারণা আত্মহত্যাস্পৃহা ছিল দুর্ঘটনার মূল কারণ। জীবনানন্দ-গবেষক ডা. ভূমেন্দ্র গুহ মনে করেন জাগতিক নিঃসহায়তা কবিকে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং তাঁর জীবনস্পৃহা শূন্য করে দিয়েছিল। মৃত্যুচিন্তা কবির মাথায় দানা বেঁধেছিল। তিনি প্রায়ই ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ভাবতেন। গত একশো বছরে কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র এক। আর এই একজনই হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, এ-সময় কবি দুই হাতে দুই থোকা ডাব নিয়ে ট্রাম লাইন পার হচ্ছিলেন। আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই হাতে দুই থোকা ডাব নিয়ে বাড়ি ফেরার সড়কে ওঠার জন্য ট্রামলাইন পাড়ি দেওয়া খুব গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়।

কাব্যগ্রন্থ

জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তথ্য এই যে, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। নিচে কেবল প্রথম প্রকাশনার বছর উল্লিখিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এর দীর্ঘকাল পর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি*। ইত্যবসরে কবির মনোজগতে যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি রচনাকৌশলেও এসেছে সংহতি এবং পরিপক্বতা। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বনলতা সেন* প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ। এটি 'কবিতাভবন সংস্করণ' নামে অভিহিত। সিগনেট প্রেস *বনলতা সেন* প্রকাশ করে ১৯৫২-য়। *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহসহ পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ *মহাপৃথিবী* প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ। জীবনানন্দর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮)। ১৯৫৪ সালে মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*।

কবির মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হল ১৯৫৭-য় প্রকাশিত *রূপসী বাংলা* এবং ১৯৬১-তে প্রকাশিত *বেলা অবেলা কালবেলা*। কবি *রূপসী বাংলা*র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলেও জীবদ্দশায় প্রকাশের উদ্যোগ নেননি। তিনি গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নাম নির্ধারণ করেছিলেন *বাংলার ত্রস্ত নীলিমা*। ১৯৫৭ সালে প্রকাশকালে এর নামকরণ করা হয় *রূপসী বাংলা*। তাঁর অগ্রন্থিত কবিতাবলী নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনগুলো হল: *সুদর্শনা* (১৯৭৩), *আলো পৃথিবী* (১৯৮১), *মনোবিহঙ্গম*, *হে প্রেম তোমার কথা ভেবে* (১৯৯৮), *অপ্রকাশিত একান্ন* (১৯৯৯) এবং *আবছায়া* (২০০৪)।

কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আকর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। পরের বছর গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় আবদুল মান্নান সৈয়দের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত আরো কবিতা অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষেত্র গুপ্ত ২০০১ সালে প্রকাশ করেন *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র*। ২০১০ সালে ভূমেন্দ্র গুহ প্রকাশ করেন জীবনানন্দ দাশের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল কবিতার আকর গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ।

গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস

তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হয় অজস্র গল্প ও উপন্যাস। এগুলোর প্রথম সংকলন সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায় *জীবনানন্দ দাশের গল্প* (১৯৭২)। বেশ কিছুকাল পর ১৯৮৯ সালে আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প*।

প্রকাশিত হয় ১৪টি উপন্যাস। এসবেব মধ্যে *মাল্যবান* (১৯৭৩), *সুতীর্থ* (১৯৭৭), ভূমেন্দ্র গুহ-ফয়সাল শাহরিয়ারের সম্পাদনায় *চারজন* (২০০৪) অন্যতম।

প্রবন্ধ

মূলত কবি হলেও সাহিত্যের অধ্যাপক কবি জীবনানন্দ দাশ জীবৎকালে কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। এগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর একটি অংশ নিয়ে *কবিতার কথা* প্রবন্ধগ্রন্থটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। বাকি প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল। ১৯৯০ সালে সর্বপ্রথম জীবনানন্দের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত-গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত সকল প্রবন্ধ এক মলাটে আবদ্ধ করে প্রকাশিত হয় *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র*। ১৯৯৯ সালে জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষে আরো কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ আবিষ্কৃত হলে প্রকাশিত হয় *জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধসমগ্র*।

পত্র

দীপেনকুমার রায়-এর উদ্যোগে ও সম্পাদনায় জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৮৫ সালে (১৯৭৮)। পরবর্তীকালে ১৯৮৬ সালে আবদুল মান্নান সৈয়দ *জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী* প্রকাশ করেন। ১০১টি চিঠির সংকলন *জীবনানন্দ দাশের চিঠিপত্র* প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে।

লিট্যার‍্যারি নোটস

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতায় ধারাবাহিকভাবে কিছু টুকরো-টাকরা কথা, টীকা-টিপ্পনী লিখতে শুরু করেছিলেন যা তিনি লিট্যার‍্যারি নোটস নামে চিহ্নিত করেছিলেন। ৫৬টি বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতায় লেখা, তারিখ ধরে লেখা। উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিসমগ্র কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকলেও দিনলিপির খাতাগুলো অসামান্য জীবনানন্দ-গবেষক ভূমেন্দ্র গুহের কাছে সংরক্ষিত। লিট্যার‍্যারি নোটস-এর খাতাগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪,২৭২ এবং শব্দ সংখ্যা ৬,৬২,১৬০-এর আশেপাশে।

দিনলিপি প্রায় ধাঁধার মত, পাঠোদ্ধারের প্রধান সমস্যা হল প্রায়শ ক্ষুদ্রায়তন অনুচ্ছেদে অসম্পূর্ণ বাক্যে লেখা, কখনও ব্যবহার করেছেন সংকেত। প্রায়ই ব্যবহার করেছেন ১ সংখ্যাটি যেমন– ১৪ আগস্ট ১৯৩১-এর পাতায় লেখা নিচে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে:

"A wonder: How 1 ashtmatic Achin & others of 1 type with apparently less means & planks than me stand where they stand"।

লিখতে গিয়ে কবি the লিখতে ১ ব্যবহার করেছেন সময় বাঁচানোর স্বার্থে। এ রকম আরও বোঝা যায়: Wd = would; Sh/shd = should; Acc = According; Re = Regarding, ?= because ইত্যাদি। তাতে পঠন সহজতর হলেও অর্থবোধ্যতা খুব একটা বৃদ্ধি পায় না। নিছকই নিজের জন্য দিনলিপির খাতায় কিছু টীকা-টিপ্পনী লিখেছিলেন জীবনানন্দ, প্রকাশের জন্য নয়।

পুরস্কার ও স্বীকৃতি

নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন ১৯৫২ সালে পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত করে। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৫৪) সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।

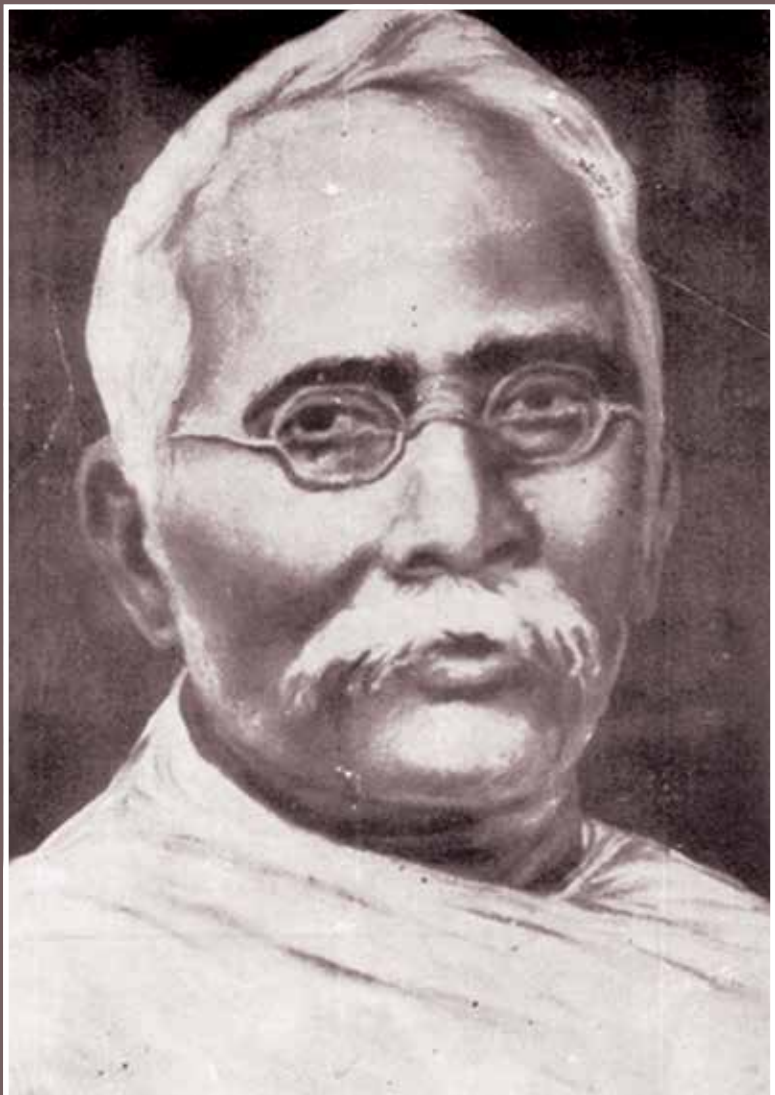

প্রবন্ধ

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

আজকে এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে বিগত উনিশ শতকের বাঙালি মনীষীদের সামনে এসে যখন দাঁড়ানো যায়, আপনিই নতজানু হতে হয় দেশ ও দশের জন্য তাঁদের সতত সংরাগের পরিচয় পেয়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার করালদ্রংষ্টা তাঁদের স্বধর্মচ্যুত করতে পারেনি। উপমহাদেশের পরাধীনতা তাঁদের এতটাই মর্মবিদ্ধ করত যে, জীবনের অন্তিম পর্যন্ত তাঁরা দেশকে শৃঙ্খলামুক্ত করার কথা চিন্তা করে গিয়েছেন। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা ভাববার অবকাশ পাননি তাঁরা। আজকের এই নিতান্ত স্বার্থপরতা আর আত্মবলয়িতার সময়খণ্ডে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করা যাবে না তাঁদের সংকল্প দৃঢ়তা তেজ একমুখিতা ও আত্মত্যাগকে।

মহাত্মা আশ্বিনীকুমার দত্ত (২৬ নভেম্বর ১৮৫৬-৭ নভেম্বর ১৯২৩) ছিলেন এরকমই একজন পুরুষ, বাঙালি নিতান্ত বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি না হলে যাঁকে এই ছল সময়ে আরো বেশি করে আশ্রয় করত। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাব ও কৃতির স্বাক্ষর রাখবার আগেই কিন্তু দেশবাসীর কাছে অশ্বিনীকুমার 'মহাত্মা' আখ্যায় ভূষিত। অবিভক্ত ও পরাধীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে অখণ্ড বাংলার বরিশাল জেলার স্থান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তবু অশ্বিনীকুমারের বরিশাল, এবং স্বয়ং অশ্বিনীকুমার ব্রিটিশ শাসকের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্মসমন্বয়, কুসংস্কার বিরোধিতা, দৃঢ়চিত্ততা, চূড়ান্ত সততা, অসাম্প্রদায়িকতা, মননশীলতা এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ, এ সবেরই সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। কেবল বাঙালির চিৎসত্তায় নয়, তাঁর স্থান হওয়া উচিত চিরন্তন মানবহিতৈষীর কোঠায়, সর্বমানবের হৃদয়ে।

কথাটা বাড়াবাড়ি শোনাতে পারে, যদি এ বক্তব্যের পেছনে কোন যুক্তি না থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁর জীবিতকালে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, তার মধ্যে প্রধান ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এর যে নানান স্তর-স্তরান্তর, নরমপন্থা-চরমপন্থা, অন্যদিকে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ, মুসলিম লীগ, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী, রাজধানী স্থানান্তর, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি। এসব হল মুদ্রার একপিঠ। অন্যপিঠে ব্রিটিশ দমননীতি, ডিভাইড এন্ড রুল নীতি, নানান দমনমূলক আইন, সাইমন কমিশন, জালিয়ানওয়ালা বাগ, স্বদেশপ্রেমীদের ফাঁসি, গোলটেবিল বৈঠক। এসবের মধ্যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের জন্ম, কর্ম ও প্রয়াণ।

অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী তো ছিলেন-ই, তার ওপর তাঁর চরিত্রের সততার কথা ভাবলে তাঁর প্রতি নতজানু না হয়ে পারা যায় না। তাঁর জন্ম তারিখটি তাঁর বাবা ব্রজমোহন বাড়িয়ে লিখেছিলেন। সে-কালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গেলে ষোল বছর বয়স পূর্ণ করতে হত। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের প্রকৃত বয়স তখন পুরো ষোল হয়নি। একথা যখন তিনি জানতে পারলেন, সেবছরে পরীক্ষা না দিয়ে পরের বছর বয়স ষোল পূর্ণ করার পরই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আজকের এই তঞ্চকতা আর মিথ্যাচারে ভরা পৃথিবীতে বসে এই নীতিবোধকে স্মরণে আনলে বিস্মিত হতে হয়।

অবিভক্ত ভারতের বাংলা প্রদেশের একটি জেলার নাম বরিশাল। নদীনালায় ভরা দেশ। তীব্রস্রোতা সে-সব নদী– আড়িয়াল খাঁ, গাবখান। বরিশাল শহরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে কুমীর-কামট-মৎস্যসঙ্কুল কীর্তনখোলা নদী। ধানসিড়ির মত স্নিগ্ধ নদীও রয়েছে এদেশে, কবি জীবনানন্দ দাশ, বরিশালের অন্য খ্যাতিমান ভূমিপুত্র যে নদীটিকে অক্ষয় করে রেখে গেছেন তাঁর কবিতার পর কবিতায়। তীব্রস্বনা নদীগুলো বরিশাল জেলাকে চারদিকে থেকে এতটাই ঘিরে রেখেছে যে যুগ যুগ ধরে বন্যা এ জেলার ললাটলিখন। আবার নদীর প্রাচুর্যই এই জেলার জমির স্বর্ণফসলপ্রসূতার কারণ। এজন্য বরিশালকে বলা হত Grannery of India। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০) বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। সংখ্যাটা এক কোটি (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মিলিয়ে যে বঙ্গপ্রদেশ তখন, সেখানকার লোকসংখ্যা তখন ছিল ৩ কোটি)।

তবু বরিশাল জেলাকে কিন্তু দুর্ভিক্ষ ছুঁতে পারেনি। আবার ১৩৫০-এর যে মন্বন্তর (ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বান্তর নামে খ্যাত, ইংরেজি ১৯৪৩ সাল), তখন এই বরিশাল থেকে খাদ্যশস্য গেছে বাংলার অন্যান্য স্থানে, এমনকি বহির্বাংলাতেও, বিশেষ করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনির জন্য। বেপরোয়া নদীর পর নদী, আর এজন্যই রেলপথ সম্ভব হতে পারেনি। মুসুরডাল, বালামচাল আর অফুরন্ত মাছ, সুপারি ও নারকেলের দেশ এই বরিশালে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও মগদের বাস। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বরিশাল নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'এখানে খাদ্যসুখের কথা বর্ণনা করা যায় না। ফল, মূল, ননী, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, মৎস্য, মাংস, তরিতরকারি, চাউল, ডাউল, মিষ্টান্ন, চিনি, গুড়, লবণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল সস্তা। নারিকেল অনেক। এখানকার মত উত্তম চাউল বোধকরি বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি নাই। বাণিজ্যক্ষেত্রে এই স্থান অতি প্রধান স্থান। বাণিজ্যদ্রব্য পরিপূরিত নৌকায় আমদানী রপ্তানি কত হয়, তাহার সংখ্যা হয় না। বাষ্পীয় জাহাজ এখানে অনায়াসেই আসিয়া থাকে।'

এই বর্ণনা পড়ে এ-জেলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি চিত্র পাওয়া গেল। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে সাধারণভাবে এর প্রভাব পড়েছে, যে কারণে এ জেলার মানুষজনের মধ্যে অপার অতিথিপরায়ণতা, আন্তরিকতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের বিকাশ হতে পেরেছে। অশ্বিনীকুমারকে নির্মাণ দিয়েছে যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, তার জলহাওয়ার বৈচিত্র্য আর বিন্যাস জেনে নেওয়া জরুরি। এজন্যই বরিশাল জেলা নিয়ে আগেভাগে কিছু আলোচনা করে নেওয়া গেল। অশ্বিনীকুমারের অসাম্প্রদায়িকতার পশ্চাৎপট যেমন রচিত হয়েছিল এ-জেলায় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভেতর। হিন্দু ও মুসলমান তো বটেই, খ্রিস্টানদেরও সম্ভ্রান্ত উপস্থিতি এ-জেলায় লক্ষ করা যায়। পলাশীর যুদ্ধের পরপরই ১৭৬৪-তে একদল ধর্মযাজক রাফেল জ্যা এনজুস-এর নেতৃত্বে বরিশালে আসেন। ১৮৭২-এই দেখা যাচ্ছে, এ জেলার শিবপুরে আটশোজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। এখানেই বরিশালের প্রথম গির্জা নির্মিত হয়। ১৯০৪-এ অক্সফোর্ড মিশন চার্চ গঠিত হয়, এবং আরও বহু আগে ১৮৪৫-এ রোমান ক্যাথলিক চার্চ স্থাপিত হয়েছিল। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে যে প্রবল খ্রিস্টীয় ভাবনা কার্যকর ছিল, তার প্রমাণ খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শে সমাজ সেবাকল্পে তাঁর 'Little Brothers of the Poor' কিংবা 'Band of Mery' আর 'Band of Hope' গঠন। খ্রিস্টধর্মের মহিমময় কল্যাণকরতা অশ্বিনীকুমারকে প্রভাবিত করেছে নিঃসন্দেহে।

তেমনি ইসলাম ধর্মকেও মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন তিনি। মুসলমান সম্প্রদায়কে অভিনয়হীনভাবে বিবেচনা করতেন আত্মজনরূপে। অপুত্রক অশ্বিনীকুমার পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন একটি মুসলমান ছেলেকে, কেবল এই তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর ধর্মমোহের কারা ভেঙে ফেলার প্রমাণ পাই আমরা। ইসলাম নিয়ে সুগভীর অধ্যয়ন ছিল তাঁর। এই অনুধ্যানকে নিবিড় করার জন্য তিনি ফার্সি ও উর্দু ভাষা শিখেছিলেন। জালালউদ্দীন রুমি-রচিত 'মসনবী', যাকে ভক্ত মুসলমানরা কোরান শরীফের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে মানেন ও পাঠ করে থাকেন, অশ্বিনীকুমার সে-গ্রন্থ পাঠ করেই তৃপ্ত হননি, অনুবাদও করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর প্রিয় ছিল হাফেজের কবিতা। হাফেজের কবিতাও অনুবাদ করেন তিনি। পরিতাপের বিষয়, এই অনুবাদগুলি পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গিয়েছে, প্রকাশিত হয়নি কোনদিন।

হিন্দু ধর্ম আর ইসলামের মধ্যে যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই, তাঁর প্রজ্ঞা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং তাঁর অন্তরের অসাম্প্রদায়িক বোধ তাঁকে এই সত্যে উপনীত করিয়েছিল। তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'A Hindu reads the Quran or the sublime writings of Maulana Rumi or the ecstatic 'Gazal' of Hafez, he will wonder at the agreement he will find in the cardinal principles of his religion and of Islam, and in the courses of what is termed 'Ishq' by the Mussulmans and 'Prema' or 'Bhakti' by the Hindus.'

বরিশাল তথা সমগ্র পূর্ববঙ্গই ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র। বরিশালে ব্রিটিশ বিরোধী যে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার পেছনে একদিকে যেমন ছিল বরিশালবাসীর স্বাধীনচিত্ততা, অন্যদিকে অশ্বিনীকুমারের প্রভাব। অশ্বিনীকুমারের স্বদেশ চেতনার বাণীবাহক ছিল প্রাথমিকভাবে তাঁর ছাত্রদল। প্রসঙ্গত, তিনি ছিলেন আদিতে, মধ্যে ও অন্তে একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তাঁর আমলে সমগ্র বারিশাল জেলা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশেই অগ্রসর। ১৮৯৭-৯৮-এ 'Govenment Report on Education' জানায়, 'The school is unrivalled in point of discipline and efficiency. It is an institution that aught to serve as a model to all schools, Government or Private.'

মিশনারিদের প্রয়াস, বরিশালে ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং সেইসঙ্গে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের শিক্ষাভাবনা, এই তিনে মিলে শিক্ষাক্ষেত্রে বরিশালে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছিল। স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রেও অগ্রণী এই বরিশাল, এমনকি অশ্বিনীকুমার যখন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, সে-সময় তাঁরই প্রয়াসে সেখানে সহশিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল, যা তখন কলকাতার কোন

কলেজে ছিল অভাবিত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তৈরি হয়েছিল অগণিত দেশপ্রেমিক, স্বদেশানুরাগী ছাত্র, যারা তাঁদের পরবর্তী জীবনে অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্ব দান করতে কুণ্ঠিত হননি। ছাত্রদের এহেন স্বদেশপ্রীতি সরকারের এতটাই গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠল যে বাংলার ছোটলাট বামফিল্ড ফুলার আদেশ জারি করলেন ব্রজমোহন কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া কোন ছাত্র সরকারি চাকরিতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আশঙ্কা ছিল, এই দমনমূলক ব্যবস্থার জেরে কলেজে ছাত্রসংখ্যা রাতারাতি শূন্যে এসে ঠেকবে। কেন-না পাশ করে সরকারি চাকরির নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে, ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের সামনে একমাত্র স্বপ্ন তো ছিল এটাই। কিন্তু ফুলার বিএম কলেজের ছাত্রদের আগ্নেয় মানসিকতা আর তাদের আচার্য অশ্বিনীকুমারের শিক্ষাদানজাত দৃঢ়ব্রত হবার সঙ্কল্পের পাঠ নিতে ভুল করেছিলেন। ছাত্রদের অভিভাবককুলের দৃঢ়চিত্ততা ও অজ্ঞাত ছিল ফুলারের। তাই এই অধ্যাদেশ জারির পরেও দেখা গেল, ফুলারের আশায় জল ঢেলে দিয়ে বিএম কলেজের ছাত্রসংখ্যা তো কমল-ই ছিল না, বরং তা আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। দেবপ্রসাদ ঘোষ এনট্রান্স পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সেরা হলেন। তিনি পড়তেন ব্রজমোহন কলেজেরই বিদ্যালয় বিভাগে। তাঁকে বৃত্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি! তবু আশ্চর্য, ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল, কী বিএম স্কুলে, কী কলেজে। শিক্ষক অশ্বিনীকুমারের প্রতি ছাত্রদের অসীম আনুগত্যের ফলেই এমনটা সম্ভব হয়ে ছিল। পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধেয় না হয়ে উঠলে এরকম নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভ করা যায় না।

কীভাবে অশ্বিনীকুমার নিজেকে এই আনুগত্যলাভের যোগ্য করে তুলেছিলেন? বরিশালে শিক্ষকতা করার আগেই তাঁর শিক্ষকজীবন শুরু হয়েছিল হুগলির শ্রীরামপুরে। সেখানে তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক। তিনি তখন সদ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করা যুবক। সেই সঙ্গে বিএল ডিগ্রিও ছিল তাঁর। সেই ১৮৮০-র চব্বিশবর্ষীয়

অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের সঙ্গে নিজেও খেলাধুলোয় অংশ নিতেন। আরো আশ্চর্যের, ছাত্ররা তাঁর কোলে মাথা রেখে গান করত। প্রবেশিকায় বৃত্তি পাওয়া তুখোড় মেধাবী ছাত্র, যাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে রংপুর, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর আর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে, যে কলকাতায় তাঁর কলেজজীবনে রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র সেনের মত বিখ্যাতজনদের সান্নিধ্যলাভ ঘটেছে, তিনি বালকদের সঙ্গে এই যে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশছেন, এই অন্তরঙ্গতার জোরেই পরবর্তীকালে ছাত্রদের কাছে যথার্থ গ্রহণযোগ্য, শ্রদ্ধেয় আর সর্বাতিশায়ী মান্য হয়ে উঠেছিলেন। গুরু যা কিছুই আজ্ঞা করেন, নির্বিচারে শিষ্য সেই আজ্ঞা পালন করবে, যোগ্য গুরু সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, গুরুরাজ্ঞা হি অবিচারণীয়া। অশ্বিনীকুমার হয়ে উঠেছিলেন তেমনই এক গুরু। রবীন্দ্রনাথ 'গুরুদেব' হওয়ার আগেই দেখি গুরু হওয়ার সাধনা শুরু হয়েছিল অশ্বিনীকুমারের, এবং তা শ্রীরামপুরে। শিক্ষকের সঙ্গে নদীতে নৌকায় বাইচ খেলব আর গান গাইব। এমন গুরু কি আমরা সবাই মনে মনে চেয়ে আসিনি? ধন্য সে-সব ছাত্র, যারা অশ্বিনীকুমারের মত, নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগরের মত গুরু পেয়েছিলেন।

আনুগত্য আরো অনেক কারণেই এসেছিল। কোন্ ছাত্রের কী অভাব, সেই বুঝে তাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, ছাত্রের অসুখ-বিসুখে তাকে নিজ হাতে সেবা করা, তাদের সঙ্গে ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম, এমন কি প্রেম ও পরিণয় নিয়েও অবাধে আলোচনা করা, এ-সবই করতেন তিনি। আমাদের শাস্ত্রেই তো এর অনুমোদন রয়েছে, 'প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ' অর্থাৎ পুত্র (এবং কন্যাও) ষোল বছরের হলে তার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ বিধেয়। বন্ধুত্বের মূর্তিমান বিগ্রহই ছিলেন যেন তিনি। কলেজের অধ্যক্ষ বই লিখছেন, যে বইয়ের নাম 'প্রেম', ভাবা যায়? ঐশ্বরিক অহেতুকী প্রেম নয়, রক্তমাংসের নারী-পুরুষের জাগতিক প্রেম নিয়ে লেখা গ্রন্থ। নাতিবৃহৎ এই গ্রন্থটি সবদেশের সব ছাত্র-ছাত্রীর অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। জাগতিক প্রেমকে বর্জনীয় মনে করা হয়নি এ গ্রন্থে, বরং প্রেম-ভালবাসাকে প্রেমিক-প্রেমিকার অলঙ্কার হিসেবেই মূল্যায়িত করা হয়েছে। এখানেই বইটির গুরুত্ব ও উপযোগিতা।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্র কেবল যে নির্দিষ্ট সিলেবাসেই সীমাবদ্ধ নয়, এবং এজন্য একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার ব্যাপকতা জীবনের বৃহত্তর ও সার্বিক স্তরে প্রসারিত করে দেওয়া, ছাত্রের কাছে যথার্থ পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠা, অশ্বিনীকুমারের জীবনদর্শন ছিল তা-ই। কেবল উপদেশে সীমায়িত না থেকে সখ্য ও সৌহার্দের সাহায্যে ছাত্রের মন জয় করতেন তিনি।

ছাত্রদের কাছে নমস্য ছিলেন তিনি তাদের কাছে নম্য হবার গুণে কিন্তু তাই বলে কখনোই নিজের ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে নয়। ছাত্রদের মধ্যে তিনি অনুস্যূত করে দিয়েছিলেন, 'সত্য, প্রেম, পবিত্রতা'র বোধ, যে তিনটি শব্দ ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। ছাত্রদের তিনি এমন এক উচ্চ স্তরের আদর্শে দীক্ষা দিয়েছিলেন যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, তাঁর বিদ্যায়তনে পরীক্ষা চলাকালীন কোন প্রহরা থাকত না! স্বদেশী ও বয়কটের প্রথম উদ্গাতা তিনি-ই। ১৯০৬-এ বরিশালে কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল, সেখানে সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রসূল। যোগদানকারীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ। সুদূর বরোদা থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। আর ছিল ছাত্রসমাজ, যারা হাসিমুখে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেছে একদিকে, অন্যদিকে 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান দিয়েছে গুর্খা পুলিশের লাঠির আঘাত অগ্রাহ্য করে। তবে প্রত্যাঘাত করেনি কোন ছাত্র, কেন-না অশ্বিনীকুমারের নির্দেশ ছিল অহিংস থাকবার।

১৯০৬-এর ১৪-১৫ (১-২ বৈশাখ ১৩১৩) এপ্রিলের বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলন আজ এক ইতিহাস, কেন-না যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিকে নিষিদ্ধ করেছিল প্রশাসন, বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই উঠে যায় সেই অধ্যাদেশ। এ খবর এদেশে এসে পৌঁছলে দশ হাজার লোকের মিছিল বেরোয় বরিশাল শহরে, অশ্বিনীকুমারকে পুরোধা করে। যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারশো টাকা জরিমানা হয়েছিল সম্মেলন চলাকালীন 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করায়, তাঁকে এনে

সংবর্ধনা দেওয়া হল। সুরেন্দ্রনাথকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অশ্বিনীকুমারের প্রস্তাবমত সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়। এই ছিলেন অশ্বিনীকুমার, বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট। সুদূর পাঞ্জাব থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত তাঁকে ঐ নামে অভিহিত করা হত।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন তিনি। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে ১৮৭৬-এ যেমন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'Indian Association' গড়ে উঠেছিল, ঠিক একই রকমভাবে ১৮৮৫-তে বরিশালে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, 'বরিশাল জনসাধারণ সভা'। উকিল প্যারীলাল রায় ছিলেন এ-সভার সভাপতি আর অশ্বিনীকুমার সক্রিয় সদস্য। এখানকার সদস্যরূপেই তিনি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৮৮৭-র কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৭-এ কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে (আমরাবতী) তিনি কংগ্রেসকে 'তিনদিনের তামাসা' বলে ব্যঙ্গ করেন। কেন-না এই বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে তিনি সদর্থক কিছু দেখতে পাননি।

সর্বভারতীয় রাজনীতি ছেড়ে তিনি তাঁর জেলা বরিশালকেই কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন অতঃপর। ১৯০৫ সালে তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বেপথু সময়ে তিনি গঠন করেন 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'। এই সমিতির মত সক্রিয় সমিতি সমগ্র বাংলায় একমাত্র 'অনুশীলন সমিতি' ছাড়া আর ছিল না। বরিশাল জেলাতে এই সমিতির ১৭৪টি শাখা দ্রুত গড়ে ওঠে। রাজনীতি ছাড়াও দুঃস্থের সেবা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আর্তত্রাণ, শরীর চর্চার মাধ্যমে দেহকে সুস্থ ও সাবলীল রাখা, গ্রন্থপাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা ইত্যাদি ভূমিকা পালন করত এখানকার সভ্যবৃন্দ, যাদের বৃহদংশই ছাত্রসম্প্রদায়।

আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন, অশ্বিনীকুমারকে সেই উক্তিটির আলোয় বিচার করলে এই দুই মনীষীর চিন্তার সাদৃশ্য দেখতে পাব আমরা। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেওয়ার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।' ছাত্রদের সঙ্গে এই নাড়ীর যোগটি ছিল অশ্বিনীকুমারের। আজীবন বিদ্যা দান করেছেন, বিদ্যা বিক্রয় করেননি কোনদিন। ব্রজমোহন কলেজে তাঁর দীর্ঘ পঁচিশ বছর অধ্যক্ষতার সময় তিনি বেতন নেননি কখনো। উপরন্তু তিনি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দান করে গিয়েছেন কলেজকে। তাছাড়া কত ছাত্রের যে বেতন জুগিয়েছেন, নিজ হাতে সেবা করেছেন, বই ও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন, তার লেখাজোখা নেই।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন যেমন ঔপনিষদিক আবহে নির্মিত, সেখানকার উপাসনালয়ের গেটে যেমন 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' লেখা দেখি বা 'তিনি আমার আত্মার আনন্দ' যেমন ধ্রুবপদ ছিল তাঁর, অশ্বিনীকুমারেরও তেমনি চালিকাশক্তি ছিল, 'সত্য, প্রেম, পবিত্রতা।' তাঁর প্রত্যেক শিষ্যের মধ্যে এই তিন গুণের তাৎপর্য ও বার্তা তিনি জারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। এবং তা এত গভীর সঞ্চারী হয়েছিল যে তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তাই এখান থেকে পাশ করা কোন ছাত্র যে সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হবে, সে তো স্বতঃসিদ্ধ। লাহোর থেকে গৌহাটি পর্যন্ত এমন কোন কলেজ ছিল না, যেখানে ব্রজমোহন কলেজের কোন না কোন ছাত্রকে অধ্যাপনা করতে দেখা যায়নি। অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনীকার ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন, 'সমগ্র বাঙ্গালায় এমন একটি বিদ্যালয়ও ছিল না, যেখানে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষকতা করে নাই।'

'প্রেম' নামে যে গ্রন্থটির কথা আগে বলা হয়েছে, সে-বইটি নিয়ে একটু আলোচনা করা জরুরি। এ গ্রন্থে স্বদেশপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি, ঈশ্বরপ্রেম যেমন আছে, তেমনি নর-নারীর প্রেম নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

এই সামগ্রিক প্রেমের ব্যাপ্তি বোঝাতে গিয়ে অশ্বিনীকুমার গ্রন্থটিতে যে-ক'টি নিশানাকে প্রেমের স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি হল, ১. আনন্দ, ২. নবত্ব, ৩. নিত্যত্ব, ৪. উচ্চত্ব, ৫. ব্যাপ্তিত্ব এবং ৬. স্বার্থরাহিত্য। বস্তুত, অশ্বিনীকুমারের জীবনের এই প্রেম ছিল তাঁর জীবনবর্তিকা যা তিনি তাঁর সামগ্রিক জীবনের বিচিত্র কর্মমুখিনতায় সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বদেশ হিতৈষণা এই প্রেমজাত, আর্তত্রাণে বারবার তাঁর মহতী ভূমিকার পিছনেও রয়েছে এই প্রেম, অর্থাৎ মানবপ্রীতি। ইচ্ছে করলে তিনি বরিশাল ছেড়ে আরো বৃহত্তর মানচিত্রে নিজেকে স্থাপন করতে পারতেন কিন্তু বরিশালের প্রতি প্রীতিবশতই তাঁর যৌবনের উপবন আর বার্ধক্যের বারানসী হয়ে রইল এই বরিশাল। প্রখ্যাত লেখক ('মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'The Economic History of India') ও একদা বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে বলেছিলেন, নাম করতে চাইলে যেন তিনি কলকাতায় বাস করেন, আর কাজ করতে চাইলে বরিশালে। নিজের জেলাকে হাতের তালুর মত চিনে নিয়ে বরিশালে রয়ে গেলেন তিনি আর তৈরি করলেন অগণিত ইস্পাত, যাঁদের কল্যাণে দুর্গতি মোচন হয়েছিল অনেকটা।

কেবল ছাত্ররাই নয়, দেশের মনীষী ও শিক্ষাব্রতীরাও এই নির্ভীক ও অন্তিম পর্যন্ত সততার প্রতিমূর্তি মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতেন। ১৯০৮-এ অশ্বিনীকুমারকে জেলে যেতে হয়। এক বছর বাদে তাঁর কারামুক্তির প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল ভগিনী নিবেদিতার? প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর রচিত, 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯১০) অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নির্বাচিত নয়জন নেতা মুক্তিলাভ করলেন। নিবেদিতার সেদিন কী আনন্দ! বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের চিহ্নস্বরূপ পূর্ণকুম্ভ ও কলাগাছ রাখা হইল এবং আনন্দের দিন বলিয়া বিদ্যালয়ে মেয়েদের ছুটি দেওয়া হইল।' হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই এক বিদ্যাদাত্রী অন্য এক বিদ্যাদাতাকে সেদিন সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখছেন, 'He organized the whole district for the Swadeshi Movement। অন্যদিকে বিপনচন্দ্র পাল তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন একইভাবে, 'In Aswini Kumar, we have a most convincing proof of the profound spirituality of the Nationalist Movement in Bengal. সুরেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্র– একজন নরমপন্থী, অন্যজন চরমপন্থী। কিন্তু দু'জনেই অশ্বিনীকুমারের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবনত। ঐতিহাসিক ড. সুমিত সরকার *The Swadeshi Movement in Bangal* গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিত্ব অরবিন্দের মত অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ না হলেও তিনি যে গণভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার নজির স্বদেশী যুগের আর কোন নেতার মধ্যে পাওয়া যায় না।'

অশ্বিনীকুমার ছিলেন বেশকিছু গ্রন্থের প্রণেতা, *কর্মযোগ*, *ভক্তিযোগ*, *দুর্গোৎসবতত্ত্ব* ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও বেশ কিছু সংগীত রচনা করেছিলেন তিনি। নানা সময়ে দেওয়া তাঁর কিছু ইংরেজি-বাংলা ভাষণও সঙ্কলিত হয়েছে। গ্রন্থকাররূপেও যে তিনি কতখানি সার্থক ছিলেন, তাঁর প্রমাণ, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ভক্তিযোগ' পাঠ করে লিখছেন, 'আমার বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত, 'আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আপনার পুস্তক পাঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন।' মনীষী রাজনারায়ণ বসুও এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হয়ে না বলে পারেননি। ধর্মের সঙ্কীর্ণতা নয়, উদারতার পরিচয় রেখেছেন লেখক, রাজনারায়ণের সন্তোষ এ-জন্য, 'তুমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই গ্রন্থ লিখ নাই, সকল সম্প্রদায়ের জন্য লিখিয়াছ, ইহা আমার বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে।... তুমি যেখানে ঈশ্বর প্রেমের বিষয় লিখিয়াছ সেই সকল স্থান অমৃত।' রেভারেন্ড স্টপফোর্ড ব্রুকের মন্তব্যটি একটু দীর্ঘ। তবু প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধার না করে পারা গেল না, 'Since I have read, I have been in another world than this noisy world of the west, where we spend our days in pursuing nothing which we think everything... the little stories which illustrate your points of thought and pratice are of great interest, and I am personally delighted with the quotations from the poets of India. The life of that great country is made clearer and nearer to me.

একটিমাত্র গ্রন্থ নিয়ে বিদগ্ধজনের এ সমস্ত প্রশস্তিবাক্য একথাই প্রমাণ করে, অশ্বিনীকুমার যদি লেখালেখিতে আরো অধিক মনোনিবেশ করতেন, তাহলে তাঁর হাত দিয়ে আমরা আরো আরো অমৃতপ্রতিম প্রসঙ্গ

১৯০৮-এ তিনি যেদিন গ্রেপ্তার হলেন, বরিশালবাসী অরন্ধন পালন করেছিল। জনৈক মিষ্টি বিক্রেতা দু'দিন উপবাসী ছিলেন। একজন মুসলমান তাঁর মুক্তি কামনায় রমজান মাসের রোজা আরো দশদিন প্রলম্বিত করেছিলেন। আর তাঁর কারাবাসের চোদ্দ মাস এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ১০৮টি তুলসী পাতা নারায়ণকে নিবেদন করতেন।

পেতে পারতাম। কিন্তু তাঁর জীবনের একটি প্রধান অংশ ব্যয়িত হয়েছে ছাত্র গঠনে, এবং তার পাশাপাশি সমাজ সেবায়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ ক্রমশ পেছনে পড়ে গেছে, যদিও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতের রাজনীতির সঙ্গে কমবেশি যোগ ছিল তাঁর। ১৯১৭-তে ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন তিনি যখন কাশীবাস করছিলেন, সে সময় কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লালা লাজপত রায়কে সভাপতি করে কলকাতায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিলেন। গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন বরিশালের বাটাজোড়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। ছাত্র-বয়সে কলকাতায় রামকৃষ্ণ দেবের দক্ষিণেশ্বরে যে একাধিকবার গিয়েছেন, সেখানে নরেনকে দেখলেও আলাপ হয়েছিল দীর্ঘদিন বাদে আলমোড়ায়, ১৮৯৭-এ। অশ্বারোহী স্বামীজীকে দেখে বিমুগ্ধ অশ্বিনীকুমার। তাঁকে 'স্বামীজী' সম্বোধন করায় স্বামীজী বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'সে কি? আপনার কাছে আমি কবে স্বামী হয়ে উঠলাম, আমি এখনও সেই একই নরেন্দ্র।' অর্থাৎ স্বামীজীর কথায় ১৮৮৫-র প্রতিধ্বনি, যেদিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণসকাশে দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এসব লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বামী গাম্ভীরানন্দ প্রণীত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'-এ। এরপর এই দুই মনীষীর যে কথোপকথন, সেখানে এক দিকে যেমন দেখি স্বামীজীর অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে, তাঁর বর্তমান শিক্ষাদাতারূপে কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য জানা রয়েছে, অন্যদিকে এ-দুজনের শিক্ষাভাবনার সমীপবর্তিতা। জাতীয় কংগ্রেস নিয়েও স্বামীজীর ক্ষোভ এখানে স্পষ্ট। 'আপনি বলতে পারেন কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য এ পর্যন্ত কী করেছে? আপনি কি মনে করেন, গোটাকয়েক প্রস্তাব নিলেই স্বাধীনতা এসে যাবে?'

তারপর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে স্বামীজীর উক্তি 'আপনার ছাত্রদের চরিত্র বজ্রদৃঢ় করে গড়ে তুলুন। বাঙালি যুবকদের হাড় থেকেই তৈরি হবে সে বজ্র যা ভারতের দাসত্বকে চূর্ণ করবে।' তারপর তিনি আনলেন অচ্ছুৎ মুচি মেথরদের কথা, আজকে যাদের ব্রাত্য, দলিত, অপর বলা হয়, পারিভাষিকভাবে নিম্নবর্গ, সাব-অলটার্ন। 'তাদের মধ্যে স্কুল বসান, আর তাদের গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দিন।' স্বামীজীর চেয়ে আট বছর বয়সে বড় অশ্বিনীকুমার, জ্যেষ্ঠকে তবু উপদেশ দিচ্ছেন! তবে তাকে যে উপদেশ দেবার দরকার করে না, স্বামীজী জানতেন না। গোপাল নামে এক মেথরকে বিষ্ঠার ভার মাথায় অবস্থায় একদিন আলিঙ্গন করে লোকচক্ষুর অন্তরালেই তিনি অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এক শিখ দারোয়ানের ধর্মবিশ্বাস যাতে আহত না হয়, সেজন্য তাঁর নিত্যপাঠ্য 'গ্রন্থসাহেব' রেখেছিলেন গদি তৈরি করে তার ওপর। অজ্ঞাতকুলশীল এক মুসলমান রাস্তায় রক্তবমি করছে, নিজের পিঠে করে তাকে বয়ে আনলেন চিকিৎসকের কাছে। বহুরূপে সম্মুখে পেয়ে ভগবানকে মানুষের নারায়ণকে এইভাবেই অশ্বিনীকুমার সেবা করে গেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বরিশালে। সেখানকার জমির অধিকাংশের মালিক ঢাকার নবাব। তবু ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের দুরূহ লগ্নে নবাবের হাটে যখন বিলেতি দ্রব্য মিলছে, অশ্বিনীকুমার হুকুম দেন নদীর অপর পারে হাট বসাবার। ফলে নবাবের পুরনো হাট ক্রেতাশূন্য। নবাবের কর্মচারীরা অবাক। তারা জানতে চাইল, 'কী আশ্চর্য! তোমরা মুসলমান! তোমরা একটা হিন্দুর হুকুমে নবাবের হুকুম অমান্য কর!' উত্তর এল, 'আপদে-বিপদে আমাদের খবর রাখেন বাবু। আকালের সময়ে ক্ষুধার অন্ন পাঠাইয়া দেন তিনি। গ্রামে ওলাওঠা লাগিলে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেন তিনি। এতকাল তো কই নবাবসাহেব আমাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ রাখেন নাই। আজ তাঁহার হুকুমে বাবুর বুকে ব্যথা দিলে খোদা নারাজ হইবেন।' একথা জানলে বোঝা যায়, কতখানি ঈশ্বরপ্রতিম ছিলেন অশ্বিনীকুমার।

ঈশ্বরপ্রতিম-ই তো। বরিশালের মানুষ তার বাড়ির প্রথম ফলটি অশ্বিনীকুমারকে নিবেদন না করে পারতেন না। গোরু বিয়োলে তার প্রথম দিনের দুধ যেত তাদের প্রিয় 'বাবু'র বাড়িতে।

১৯০৮-এ তিনি যেদিন গ্রেপ্তার হলেন, বরিশালবাসী অরন্ধন পালন করেছিল। জনৈক মিষ্টি বিক্রেতা দু'দিন উপবাসী ছিলেন। একজন মুসলমান তাঁর মুক্তি কামনায় রমজান মাসের রোজা আরো দশদিন প্রলম্বিত করেছিলেন। আর তাঁর কারাবাসের চোদ্দ মাস এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ১০৮টি তুলসী পাতা নারায়ণকে নিবেদন করতেন। দু'দিন উপোস করেছিলেন যে মিঠাইওয়ালা, উত্তরভারতের লোক ছিলেন তিনি। অশ্বিনীকুমারের মুক্তির জন্য পুরি-তরকারিও মানত করেছিলেন।

এসব কিংবদন্তী নয়, লিখিত ইতিহাস। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সুরেন্দ্রনাথ সেন, অশ্বিনীকুমারের অন্যান্য জীবনীকার যেমন শরৎকুমার রায়, সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, তপংকর চক্রবর্তী প্রমুখের লেখার মধ্য দিয়ে সুচারুভাবে চিত্রিত হয়েছেন তিনি। 'বরিশালের ইতিহাস'প্রণেতা সিরাজউদ্দীন আহমেদ তার বইয়ে বাটাজোরে অশ্বিনীকুমার দত্তের বংশলতিকা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বহু তথ্য পাই এ গ্রন্থে। যেমন অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন ব্রজমোহন-প্রসন্নময়ী দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর অপর দুই সহোদর যথাক্রমে কামিনীকুমার এবং যামিনীকুমার। বরিশালের অন্যতম সমাজসেবী রাজনীতিবিদ মহিলা ফুলরেণু গুহ ছিলেন অশ্বিনীকুমারের জ্ঞাতি। অশ্বিনীকুমারের বিবাহ হয়, নথুল্লাবাদের মীর বহর পরিবারের সরলাবালার সঙ্গে ১৮৭২ সালে, তিনি যখন সবে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পাশ করেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে তিনি বিএ পাশ করেন। আর এম এ পড়তে আসেন ফের প্রেসিডেন্সিতে। বিএল-ও হয়েছিলেন তিনি। কৃষ্ণনগর জেলা স্কুলে ও পরে শ্রীরামপুরের একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করে তিনি বরিশাল ফিরে গিয়ে ওকালতি ব্যবসায়ে যুক্ত হন। অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন, নৈতিকতা বজায় রেখে এ পেশায় টিঁকে থাকা সম্ভব হবে না। ১৮৮৪-র ২৭ শে জুন তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে পড়ানো শুরু করেন। ১৮৮৯-র ১৪ই জুন স্থাপন করেন পিতার নামে 'ব্রজমোহন কলেজ', সংক্ষেপে বিএম কলেজ। প্রসঙ্গত তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্ত ছিলেন পেশায় মোক্তার। তিনি নিজেও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

অশ্বিনীকুমারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সারস্বত সমাজের এক আলোকিত বলয়– রজনীকান্ত গুহ, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী), সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারিণীকুমার গুপ্ত (পেশায় চিকিৎসক), মনোমোহন চক্রবর্তী (বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক। উল্লেখ্য, অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে মন্ত্র নিয়ে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরে আসেন), নিশিকান্ত বসু (চিকিৎসক এবং গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রোৎসাহী), নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (এই বিস্মৃত স্বদেশপ্রেমী বিএম স্কুলের গোড়ার দিকের ছাত্র। বরিশালে জনহিতকর কাজে অগ্রণী, শিক্ষাবিদ। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে পেনশন বর্জন করেন। শেষজীবনে রাঁচীতে ছিলেন। 'দেশ, 'যুগশঙ্খ' ইত্যাদি পত্রিকায় খেড়িয়া, হরিজনদের নিয়ে লিখতেন মহাশ্বেতা দেবীর অনেক পূর্বে), রামচন্দ্র দাশগুপ্ত (স্বদেশী গান রচয়িতা। 'জাগরণ, দৈববাণী, 'দীক্ষা' নামে বই আছে তাঁর), দুর্গামোহন সেন (বরিশাল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বরিশাল হিতৈষী'র সম্পাদক। স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয়

কেবল কলকাতাতেই তিন-তিনটে অঞ্চলের নাম অশ্বিনীকুমারের নামে। টালিগঞ্জে রয়েছে অশ্বিনীনগর, রয়েছে গড়িয়াহাটে ট্র্যায়াঙ্গুলার পার্কে (এখানে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের একটি বাড়ি রয়েছে), এবং বাগুইহাটিতে। কলকাতায় প্রয়াত হন তিনি, ১৯২৩-এর ৭ই নভেম্বর। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

কর্মী), মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (স্বদেশী আন্দোলনে ১৯০৭-এ দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে বলতে গিয়ে জানান, 'We want a warrior class and not a race of shop-keepers in Bengal.' গিরিডি ও কোডারমায় অভ্রখনি ছিল বলে ডিনামাইটের পারমিট পেতেন। সেখান থেকে বারীন্দ্রনাথ ঘোষকে ডিনামাইট দিয়েছিলেন। ব্রিটিশের কোপে পড়ে রেঙ্গুনের কারাগারে প্রেরিত হন। এ সময় খনির মালিকানা চলে গিয়ে সর্বস্বান্ত হন) এঁদের মধ্যে কতিপয়। অশ্বিনীকুমার যাঁকে নিকটতম জন হিসেবে পেয়েছিলেন, ব্রজমোহন স্কুল ও একই সঙ্গে কলেজের শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কল্প ছিল, বাবা হবেন না, দীক্ষাগুরু হবেন না, গ্রন্থকার হবেন না। অন্যদিকে বিএম কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ বাংলা ছাড়াও গ্রিক, ল্যাট্রিন, ইংরেজি, সংস্কৃত আর ফারসি ভাষা জানতেন। মূল গ্রিক ভাষা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুবিশাল দুই খণ্ডে তিনি সক্রেটিসের জীবনী লেখেন, যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছিল। তাঁর লেখা *আন্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা* আর *সম্রাট মার্কাস অরোলিয়াস*ও দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ প্রকাশক, ঔষধ প্রস্তুতকারক উপেন্দ্রনাথ সেনকেও এই বলয়ে আমরা দেখি, যিনি ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে একদিকে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেন, *বেঙ্গলী* ও *হিতবাদী* পত্রিকার উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন, 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' পরিচালনা করেন ও সর্বোপরি অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে পালন করেন সক্রিয় ভূমিকা। উল্লেখ্য, প্রায় একই সময়ে দাঁড়িয়ে সুদূর মাদ্রাজে বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রাহ্মণ্য ভারতীও জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিলেন।

ছাত্রদের তিনি বন্ধুর মত ভালবাসতেন, তবে কোথাও বিলাসিতা দেখলে তা বরদাস্ত করতেন না। বিলাসিতার জন্য একটি ছাত্রকে তিনি ট্রান্সফার সার্টিফিকেট পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তাঁর আর্দশনিষ্ঠা ছিল এতটাই কঠোর। এর বহুকাল পরে মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে ফেরার পথে পুরীতে এক যুবক তাঁকে আপ্যায়ন করেন। বরিশাল ফিরে তিনি পত্র পান, 'তেরো বছর আগে বিলাসিতার জন্য আপনি যাকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, আমি সেই। আপনার ভর্ৎসনায় আমার চৈতন্য হয়। আপনি জেনে সুখী হবেন যে আমি বিলাসিতা একদম বর্জন করেছি।' শাস্তিদানের সদর্থক দিকও তাহলে আছে!

১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার ও সেইসঙ্গে ময়মনসিংহের কৃষ্ণকুমার মিত্র (যিনি ১৯০৬-এ বরিশাল জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা) গ্রেপ্তার হলেন সম্ভবত আলিপুর বোমা মামলার সূত্র ধরে। ধৃত প্রায় সকলেরই দ্বীপান্তর হলেও অরবিন্দসহ তাঁদের দু'জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। চরমপন্থী রাজনীতি করিয়েদের দলে ছিলেন তিনি, এ থেকেই তা অনুমিত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত *স্বদেশবান্ধব সমিতি*র বহু সদস্যই চরমপন্থায় বিশ্বাসী। চরমপন্থা, এবং তার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতা, এই দুই বৈশিষ্ট্যে অন্বিত ছিল তাঁর *স্বদেশবান্ধব সমিতি*। সে-সময়কার, আরো বহু সমিতি, যেমন ময়মনসিংহের *সাধনা* ও *সুহৃদ সমিতি*, ফরিদপুরের *ব্রতী সমিতি*, ঢাকার *মুক্তিসঙ্ঘ*, পুলিনবিহারী দাসের *ঢাকা অনুশীলন সমিতি* কার্যকর ছিলেন। অধ্যাপক সুমিত সরকার জানিয়েছেন, পুলিনবিহারী দাসের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল। তিনি লিখছেন, 'পুলিনবিহারী দাস-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা অনুশীলন গোড়া থেকেই তার কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত করেছিল শরীরচর্চা আর হিন্দুত্বের আচারে আবিল শপথের মাধ্যমে কর্মীদলের গুপ্ত প্রশিক্ষণে।' আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বদেশী প্রচারে এই সাম্প্রদায়িকতা-সঙ্কীর্ণতা দেখেই রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাধি ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না।' আমাদের মূল সমস্যা হল, 'আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধ্যান।'

যা হোক, অশ্বিনীকুমারের *স্বদেশ বান্ধব সমিতি* কিন্তু সালিশি সভা বসিয়ে মামলা মোকাদ্দমা দ্রুত মিটিয়ে দেবার দায়িত্বও নিয়েছিল। এতে একদিকে বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি হত, অন্যদিকে অর্থ ব্যয় থেকে বাদী-বিবাদী বেঁচে যেত।

অশ্বিনীকুমারের গড়া অন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান হল, *বরিশাল সেবা সমিতি*। এর জন্মলগ্ন ১৯০৭। কলকাতায় গড়ে ওঠে এটি। উদ্দেশ্য, বরিশাল-আগত ছাত্রদের পরিষেবা দেওয়া, শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে সহায়তা দান, চিকিৎসার জন্য আগতদের যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পরবর্তীকালে আরো বহুবিধ কর্মধারা যুক্ত হয় এর সঙ্গে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল এই সমিতির প্রকাশনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ। বানারিপাড়ার ভূমিপুত্র শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে ও কর্মতৎপরতায় গড়ে ওঠে এই প্রকাশনা। তাঁর একক প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় একশোর মত বই। সুরেন্দ্রনাথ সেন রচিত মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের জীবনীসহ বেশ কয়েকজন বরিশালবাসীর জীবনীগ্রন্থমালা প্রকাশ করেছেন যেমন যতীন্দ্রনাথ, তেমনি জেলার কংগ্রেসের বিবরণী, যা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের আকর। রজনীকান্ত গুহ-রচিত আত্মজীবনীও এই প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অশ্বিনীকুমার দত্ত রচনাবলীও তাঁরই উদ্যোগে বেরোয়, যদিও অন্য প্রকাশনা থেকে ('অধ্যয়ন')। রচনাবলীর ভূমিকা লেখেন যতীন্দ্রকুমারের অগ্রজ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। মণীন্দ্রকুমারের পুত্র কবি শঙ্খ ঘোষ, যতীন্দ্রকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র। *সেবা* নামে একটি সাময়িকপত্রও প্রকাশিত হত যতীন্দ্রকুমারের উদ্যোগে। তাঁর প্রয়াণের পর পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। যতীন্দ্রকুমারের নিষ্ঠা, তামাম কলকাতা ঘুরে উদ্বাস্তুদের সুলুক সন্ধান, বহু মানুষকে দিয়ে লেখানো, এসব দেখে মনে হত তিনি যথার্থ অর্থেই ছিলেন পরার্থপরায়ণ। যতদিন সুস্থ ছিলেন, কলকাতা পুস্তক মেলায় স্টল দিতেন *বরিশাল সেবা সমিতি*র, জল ও বাতাসা দিয়ে আগন্তুকমাত্রকে আপ্যায়ন করতেন। চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন চিরায়ত বরিশালের আন্তরিকতা-আতিথেয়তার প্রতিমূর্তি। প্রতিবছর বরিশালের কোন-না-কোন কৃতী ব্যক্তিকে সম্মান জানানো, বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা, বার্ষিক পিকনিকের আয়োজনের মাধ্যমে অতীত বরিশালবাসীদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ এনে দিতেন। এখন তার রেশ মিইয়ে গেছে।

কেবল কলকাতাতেই তিন-তিনটে অঞ্চলের নাম অশ্বিনীকুমারের নামে। টালিগঞ্জে রয়েছে অশ্বিনীনগর, রয়েছে গড়িয়াহাটে ট্র্যায়াঙ্গুলার পার্কে (এখানে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের একটি বাড়ি রয়েছে), এবং বাগুইহাটিতে। কলকাতায় প্রয়াত হন তিনি, ১৯২৩-এর ৭ই নভেম্বর। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

অশ্বিনীকুমারের যুগ আর আজকের, কতই না তফাৎ! তিনি যে জীবনাদর্শ রেখে গিয়েছেন আমাদের সামনে, তা যদি অনুসরণ করতে পারি আমরা, মানুষ হিসেবে, জাতি হিসেবে আমরাই সমৃদ্ধ হব। তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন, যেখানে থাকবে, প্রধান হয়ে থাকবে; জুলিয়াস সিজারেরই যেন বাক্যবন্ধ এটি– 'I shall rather be the first man in a village than the second in Rome.'

অশ্বিনীকুমার লিখেছেন, 'দধীচি তাঁহার অস্থি দান না করিলে দেবতাগণ জয়ী হইতেন না। আমরাও আমাদিগদের হৃদয়ের উদ্যম ও ধৈর্য দ্বারা যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নির্মাণ করিব, তাহা দ্বারাই এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব।' অশ্বিনীকুমারের 'এই সংগ্রাম' কিন্তু ফুরোয়নি এখনো, যেন মনে রাখি।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ভারতের কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক

আকাশ যখন ক্যানভাস

শেলী সেনগুপ্তা

প্রতিদিন আকাশ আঁকি, চলতে চলতে
যেন আলপথ থেকে ছিন্ন না হই,
প্রতিদিন চিঠি লিখি
পড়শি পাখির ঠিকানায়!

প্রতিদিন চিঠি ফেরে
বদলে যাওয়া ঠিকানা ছুঁয়ে!

এখন আমার দিন কাটে
অরণ্যচারী বৃক্ষের নিষ্ফল ক্রন্দনে,
কথাগুলো ঝরে পড়া
পৌষের হলুদ পাতা,
পায়ের নিচে ভেঙে যায়
স্বজনের শববাহী সন্তপ্ত যাতনায়!

এখন আকাশে আঁকি
নির্মোহ, নির্বিকার এক সন্তের যুগল ভ্রূ!

লালন পাখি

এস এম তিতুমীর

ছেউড়ি মেলায় বসে গানের ভেলায়
তাই নিয়ে যা একটু দোলা
তুই নাকি আত্মভোলা। আমার কথাই ভাবিস শুধু
মাঘ বিহানে পুকুর স্নানে ভরা কলস ডুবাস কেনে
কেনে যে তোর ভাদর গাঙে রূপের ডিঙা আপনি টানে
কেনে যে তোর কাছি কাটে যোলর কোলে, বাদাম ছিঁড়ে
মাঝ দরর‍্যায় ডুবল তরী হাপুস করে
বলেছিস তুই, এসব শুধু আমার কথা, মনোবেড়ির মায়ায় বাঁধা
তাই ভেবেছি পাগল আমি, দারুণ ক্ষ্যাপা
সুন্দরী, তোর মনের মতন সাধু হলে পথ হয়ে যায় থাকি শুয়ে
পাখা খুলে যায় হেঁটে যায় আমার ওপর
তোর সোহাগী লালন পাখি আমারই সব জ্বালা ধুয়ে

বদলে যাওয়া রঙ

তাহামিনা কোরাইশী

মেঘেরা বদলে দেয় আকাশের রঙ
চোখের শেঁউতি ধূসর পাল্কি হয়ে জনারণ্যে হারায়
আকাশ জ্বেলে দেয় নক্ষত্র পিদিম
মেঘলা মনের গহীনে বর্ণিল স্মৃতি তুমি
পদ্মনাভ মদিরা নয়ন উন্মত্ত প্লাবন
হারাই হারাই বলে সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি সেই দিন।

আশার জোনাক জ্বেলে দেয় বাতি
পথ চলি তার পায় পায়
কত দূর আর কত দূর বলো যাবো কত দূর
অভিমানের আবরণে ঢাকা থাকে প্রেম সে মরণব্যাধি
ভিখেরির মত দু'নয়নে করুণা ঢেলে চাইতে পারিনি বলে
জোটেনি মুষ্টির চাল
বদলে যায় অনুভূতির রঙ
ধূসর মেঘ রূপোরঙে নাইয়ে দেয় আজ এই চন্দ্রাবতী মন
অতঃপর হেসে ওঠে রঙধনু রোদেলা নীলাকাশ।

জল জ্যোৎস্নার স্বপ্নে

মীম মাশকুর

এই শোন-না শিশিরবিন্দু দেখবে পাতায় পাতায়?
হুম দেখব! দেখাবে তো?
– না তুমিও পালাবে দুষ্টু বালিকা হয়ে!
জলজ্যোৎস্না দেখাবে বলে
জলে ভেজা অভিসারিকার মত!
এই শোন, সন্ধ্যামালতি দেখবে? বর্ণিল সুরভিত?
হুম্ খুব দেখব! দেখাবে?
– না তুমিও ভোলাবে ছল হাসিতে
দোল পূর্ণিমা দেখাবে বলে
সারারাত অপেক্ষায় রাখা রাধার মত!
আহা শোনই না– সূর্যোদয় দেখবে! খোলা প্রান্তরে?
দারুন! দেখব তো! দেখাবে!
– না তুমিও শেখাবে গন্ধম জ্ঞানোদয়ে
আচম্বিতে পথ হারানো পথের
দিশা– পড়শি লাজুক নববধূটির মতন!
এই শোন, ভ্রমর দেখবে গুঞ্জরণে বিভোল?
হুম দেখব! দেখাবে তো?
– না তুমিও হুল ফোটাবে লোভ-কামের
পদ্মমধুর কথা বলে
হারিয়ে যাবে মধুযৎপিয়ং শেষে!
সব ভুলে যাও। চল দেখে আসি
সমুদ্রবেলায় আছড়ে পড়া সফেদ ঢেউ, দেখবে?
হুম। খুব দেখব, কিন্তু জানো!
আমার আজন্ম সাধ ছিল সমুদ্রস্নানের
অথচ দেখ সবাই স্নান সেরে হারিয়ে গেল–
কখন যেন অজানিতে নিজেই সমুদ্র হয়ে গেলাম!

শহীদ মিনার, তোমাকে সালাম

বিমলকৃষ্ণ রায়

শহীদ মিনার নির্বাক দাঁড়িয়ে আছ
মুক্তির প্রতীক অতন্দ্র প্রহরী।
ঊনসত্তর থেকে একাত্তর
স্বাধীনতা, বিজয় দিবস,
সংগ্রামী চেতনা,
সমগ্র অর্জন;
তোমার শক্তির ছোঁয়ায়
পেয়েছে গন্তব্যের সঠিক ঠিকানা।

শহীদ মিনার, তুমি কালের সাক্ষী,
তুমি ইতিহাস, তুমি দিন বদলের
অঙ্গীকার, দুরন্ত আহ্বান।

ফাল্গুনের আট, তেরশ' আটান্ন
অমর একুশ উনিশশ' বায়ান্নে
রাজপথে রক্তের আল্পনা এঁকে
সালাম, জব্বার, সফিউর, রফিক,
শিমুল, পলাশ কিংবা কৃষ্ণচূড়া হয়ে যায়।
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে সমগ্র স্বদেশ
বর্ণমালার জন্যে, ভাষার জন্যে।
ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে চায়
শব্দ সৈনিকেরা, ফাঁসির দাবী নিয়ে আসে
প্রতিবাদী কবিতা ও গানে অবিরাম।
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে–
রাজপথ, শহর-বন্দর-গ্রাম, একাকার
বিক্ষোভে কাঁপে দেশ।

প্রতিষ্ঠা পায় মায়ের ভাষা,
আজও তাই একুশে ফেব্রুয়ারি
মানুষের ঢল্ নামে,
অসীম শ্রদ্ধায় হেঁটে যায় নগ্ন পায়ে
মুখে থাকে শোকের সঙ্গীত।
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি,
ছেলেহারা শত
মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলিতে পারি।"
চতুর্দিক স্মৃতির মিছিল, শোকের মিছিল,
শোকের মিছিলে ভাসে,
শহীদের মুখ, উচ্চারিত হয়
বাংলা বর্ণমালা অ, আ, ক, খ,
ফুলে ফুলে ভরে যায় মিনারে বেদী।
শহীদ মিনার, নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা
শক্তির প্রতীক, তোমাকে সালাম।

যে বাঁধনে মিল নেই

সেহাঙ্গল বিপ্লব

তোমার হাতে আজ কেন ফুলের বদলে দেখছি
প্রত্যাখ্যানের গ্রেনেড? ছুড়ে মারলে ক্ষতবিক্ষত
হবে এতদিনে তোমার স্পর্শে সিক্ত হওয়া দেহ।

চোখে বিস্ফারিত হচ্ছে সীমাহীন ঘৃণার বারুদ
যার সামনে দাঁড়াতে পারছি না এক মুহূর্তও।
বারুদের উত্তাপে পুড়ছে হৃৎপিণ্ড।

মুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যের শব্দে প্রকম্পিত
হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী। বুঝি এখনই ধ্বংস হবে
শেষ জামানায় মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম।

যে সময়টুকু চুপ থাকছ কেঁপে কেঁপে উঠছে
ঠোঁট, যেখানে চুম্বনে চুম্বনে রচনা করলাম
আগামীর জন্য বাস্তবিক সুখের সফল নীড়।

আর যেন থেমে থেমে ফুঁসে উঠছে তোমার বুক,
যে বুকে জড়িয়ে নিতে ভালবাসা পরম আশ্বাসে।
কেন তবে সেখানে বাজছে ধ্বংসের দামামা?

যে আঙুল হাতের মুঠোয় জড়িয়ে চলতে পথ
সে আঙুল নেড়ে আজ শাসিয়ে যাচ্ছ একের পর
এক মিথ্যে অভিযোগে ছলনার নিখুঁত কৌশলে।

সব ভুলে যেতে চাও যাবে তবে কেন বেঁধেছিলে
ভঙ্গুর বাঁধন? যে বাঁধনে মিল নেই পুরোটা অমিল!
যে হাতে শোভা পেত ফুল, সে হাতে ভয়ানক মৃত্যু!

পরস্পর

হাসান হাবিব

এক তরুণ সাধক ভুলে যাবেন রবীন্দ্রনাথকে– একেবারে। মানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সাহিত্য, সংগীত, কলা সবকিছু– এমনকি রবীন্দ্রনাথের সুশোভিত শ্মশ্রু থেকে দাঁত পর্যন্ত ভুলে যাবেন। মোটামুটি ভুলতে হলে যতরকম প্রয়োজন ঠিক ততটা।

খবর শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল সব রবীন্দ্রভক্তের। ক্রোধ নিয়ে তরুণ সাধকের কাছে ছুটে এলেন সবাই। কিন্তু কী অদ্ভুত– সবাই দেখল, সাধকের বুকপকেট জুড়ে খেলছে নারী ও নাভী। মুগ্ধ হলেন সবাই। কিন্তু রবীন্দ্রমোহমুক্ত হওয়া সে মুহূর্তে সম্ভব ছিল না কারো– কারণ উদ্ধত একভক্ত ছুটে এলেন; বললেন, নারীদের সবাই ছিল রবীন্দ্রপাঠে মুগ্ধ... কিন্তু সবাই জানত, সাধকটি কৌশল শিখেছে রবীন্দ্রনাথকে ভুলে থাকার...

পৌরাণিকী

উপেক্ষিতা ঊর্মিলা

হিমাদ্রিশেখর সরকার

ঊর্মিলার যাবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু ছোটবোন মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি তাকে বারবার অনুরোধ করছে– 'চল্ না দিদি, সবাই তো যাচ্ছে। তুই এত বড় প্রাসাদে একা একা কেমন করে থাকবি?'

মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি তারই আপন কাকাতো বোন। কাকা বীর কুশধ্বজের দুই মেয়ে। হরধনু ভঙ্গ পর্বের সমাপ্তিতে যেদিন মিথিলাধিপতি জনক-কন্যা সীতাকে জয় করে নেন রাম, সেদিনই সিদ্ধান্ত হয়, রাম বিয়ে করবেন জ্যেষ্ঠাকন্যা সীতাকে আর ছোটভাই লক্ষ্মণ করবেন তাঁরই ছোটবোন ঊর্মিলাকে। কিন্তু মুনি বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতানুসারে রাজর্ষি জনকের কাছে রাজা দশরথের হয়ে করে বসলেন আরেক আবদার– 'আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মশীল কুশধ্বজের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না দুই কন্যা আছে; আমরা রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীরূপে ঐ দুটিকে প্রার্থনা করছি। দেখুন, মহীপাল দশরথের পুত্রেরা সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন। অতএব এক্ষণে আপনি ঐ উভয়কে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহসম্বন্ধ নির্ধারণ করে ইক্ষ্বাকু কুলকে বন্ধন করুন। এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় করবেন না।'

দুই মুনির আবদার রক্ষা করলেন রাজা জনক। একই দিনে চারকন্যা সম্প্রদান হয়ে গেল। একই প্রাসাদে চলে এলেন চার বোন। এরপর 'অযোধ্যাকাণ্ডে' কত কী ঘটে গেল। সে-সব কাহিনি সবারই কমবেশি জানা। রাম বনবাসী হলেন। সহগমন করলেন সীতাদেবী আর রামভক্ত লক্ষ্মণ। তাঁকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। তিনি রামের সঙ্গে যাবেনই। কিন্তু স্ত্রী ঊর্মিলাকে সঙ্গে নেবেন না লক্ষ্মণ। সকলে লক্ষ্মণ ও সীতাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। বললেন, তাঁদের এ ত্যাগ, এ আদর্শ সত্যি অতুলনীয়। কিন্তু একটিবার ঊর্মিলার কথা কেউ মুখে উচ্চারণও করলেন না। পতিব্রতা সীতা রামের কাছে থেকে চোদ্দটি বছর স্বামীসেবা করবেন। কিন্তু ঊর্মিলা? তিনি কার পাশে থাকবেন? কার সেবা করবেন? তাঁর কি স্বামীসঙ্গের প্রয়োজন নেই? কেউ একবারও ভেবে দেখলেন না, আজ যিনি সবচেয়ে বেশি ত্যাগস্বীকার করেছেন তিনি ঊর্মিলা। তাঁর বুকের হাহাকার তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

রাম লক্ষ্মণ আর সীতা দু'জনেরই সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। আর ঊর্মিলার যিনি প্রিয় ব্যক্তি তিনি তো চললেন রাম-সীতার চরণসেবায়। হায়রে ঊর্মিলা! জীবনের চারদিকের নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে একটি আশার প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরব্যাপী। এক সূক্ষ্ম সুরমূর্ছনা দিয়ে ভরে তুলতে হবে ভগ্নবুকের সমস্ত শূন্যতাকে।

বিদায়ের আগে নিছক 'কর্তব্যের খাতিরে' লক্ষ্মণ দেখা করতে এলেন ঊর্মিলার সঙ্গে। ঊর্মিলা বুঝতে পারলেন এখানে কোন ভাব-ভালবাসার ব্যাপার নেই। নিছকই দায়সারা বিদায়ী সাক্ষাৎকার। ঊর্মিলা কষ্ট পেলেন। কিন্তু মনোকষ্টের ব্যাপারটা লক্ষ্মণকে বুঝতে দিলেন না। তিনি হাসিমুখে পতিদেবতাকে বিদায় দেবার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু চোখের জল কী বাঁধ মানে? ঊর্মিলার চোখে ঠিকই জল এল। তিনি অনেক কষ্টে তা সংবরণ করে বললেন– 'আমি সব জেনেছি। আমিও বলছি, আপনার যাওয়াটাই কর্তব্য। আমি আপনার সাথে যেতে চাইব না। তাহলে আপনার বৃহত্তর কর্তব্য পালনের পথে অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। আজ আমার কোন দুঃখ নেই। আপনার মত কর্তব্যপরায়ণ ও আদর্শ স্বামী পেয়ে আমি গর্ব অনুভব করছি।'

বলেই অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন ঊর্মিলা। একথা যে ঊর্মিলার অভিমানাহত হৃদয়ের কথা তা বেচারা লক্ষ্মণ বুঝতে পেরেছেন কিনা তাও বোঝা গেল না। তিনি কোন কথাই বললেন না। তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রাসাদের বাইরের দিকে একটি মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ঊর্মিলা। এরপর সুদূরের পানে তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ। ভাবলেন, এই প্রাসাদে থাকাকালেও বিশেষ কোন কথা বলতেন না লক্ষ্মণ। তবুও তো রোজ একবার করে হলেও রাত্তিরে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। তাঁর রুক্ষ কঠিন মনের কন্দরে কোনদিনও প্রবেশাধিকার পাননি হতভাগী ঊর্মিলা। তবু রোজ একবার করে হলেও তাঁর 'সোনার অঙ্গ' স্পর্শ করার সুযোগ পেতেন। এখন থেকে তাও পাবেন না। দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর দেখা হবে না দু'জনের।

বাইরে তখন প্রথম প্রহরের স্বর্ণাভ রোদ। 'সোনার অঙ্গ' কথাটা মনে পড়তেই ঊর্মিলা ফিরে গেলেন মিথিলারাজ্যের সেই স্মরণীয় দিনটিতে। মিথিলার রাজদরবারের সম্মুখপ্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যখন চলছিল হরধনু ভঙ্গের পর্ব, তখন প্রাসাদশীর্ষে অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে চলছিল লঘু হাস্য-পরিহাস। হরধনু ভাঙার আগেই রামকে দেখে সীতা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হরধনু ভাঙার পর রাজা জনক স্থির করেছেন সীতাকে রামের হাতে আর ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হাতে তুলে দেবেন। একথা জানার পর ঊর্মিলা সখীদের নিয়ে হাস্য-পরিহাসে সীতাকে রাগাবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল রাম শ্যামাঙ্গ আর লক্ষ্মণ গৌরাঙ্গ। শক্তিতে রাম শ্রেষ্ঠ আর রূপে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ। সীতার সখীরা শ্যামলের পক্ষে। তাদের ভাষায়, যা কিছু শ্যামল তাই শীতল। শ্যামলে অঙ্গ রাখলে অঙ্গ জুড়িয়ে যায়। প্রাণ শীতল হয়। ঊর্মিলাও কম যান না। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তোমরা ভুলে যেও না সখী, জগতে যা কিছু স্বর্ণিল– তাই বর্ণিল। দেখলে চোখ জুড়ায়, মন ভরে।' এভাবে অনেক তর্ক-বিতর্কে ঊর্মিলা লক্ষ্মণের রূপগুণের সাফাই গেয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ? তিনি ঊর্মিলাকে কতটুকু ভালবেসেছিলেন?

ঊর্মিলার মনে পড়ে যায় বাসর রাতের কথা। বাসর ঘরে ঊর্মিলার ইচ্ছে হয়েছিল লক্ষ্মণের শরীর ছুঁয়ে দেখতে তা তপ্ত কিনা। কারণ সখীরা বলেছিল যা কিছু সোনার মত উজ্জ্বল তা-ই তপ্ত। কিন্তু তাঁর এ দেহস্পর্শ লক্ষ্মণ ভালভাবে নেননি। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। এরপরও স্বামীদেবতাটি তার সঙ্গে কোনদিন হেসে কথা বলেননি। আদর বা কোনপ্রকার প্রণয়ালাপ করেননি।

অন্যান্য ভাইদের চেয়ে লক্ষ্মণই সবচেয়ে বেশি রামভক্ত। রামের আশেপাশেই কাটে তাঁর সারাদিন। তারপর রাতে এসে অন্তঃপুরের শয়নগৃহে গম্ভীরভাবে শুয়ে পড়েন। কোন প্রশ্ন না করলে নিজ থেকে কোন কথা বলেন না তিনি।

রামও সারাদিন একেবারে বাইরে-বাইরেই থাকেন। তবু ঘরে ফিরে সীতার সঙ্গে তাঁর প্রেমালাপ চলে। তাঁরা অনেক প্রেমের কথা, অনেক প্রয়োজনের কথা বলেন। তাঁদের ঘর থেকে ভেসে আসে অনেক সোহাগসিক্ত প্রেমালাপ। তাঁদের নৈশনিবিড় সাহচর্যের কথা পরদিন দিদি সীতা গল্পচ্ছলে বলেন ছোটবোন ঊর্মিলাকে। ঊর্মিলা সবকিছু চুপ করে শুনে যান। তার তো বলার কিছু থাকে না। ব্যর্থতার হাহাকারে ভরা তার নৈশজীবন। ঊর্মিলা ভাবেন, আদর্শপুরুষ রামের কাছ থেকে লক্ষ্মণ কতকিছু শিখছেন কিন্তু 'পত্নীপ্রেম' কাকে বলে তা শিখতে পারলেন না কেন?

আজ কত কষ্টের কথাই না মনে পড়ছে ঊর্মিলার। যেখানে তাকে জোর করে নিয়ে যাবার কথা সেখানে বনবাসে যাবার সময় ঊর্মিলাকে সঙ্গে নেবার বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখাননি লক্ষ্মণ। আর তার নিজের দিদি সীতা? সীতাও তো একই বিষয়ে ছিলেন নির্বিকার। ঊর্মিলাকে সাথী করার আগ্রহ তো তার মাঝেও দেখা যায়নি!

সীতা কেমন করে তার ভাল চাইবেন? সীতা তো তার রক্তের কেউ নন। যজ্ঞভূমি হলকর্ষণের সময় লাঙলের রেখা বা সীতায় জনকরাজ তাকে প্রাপ্ত হন। তাই তার নাম রাখা হয় সীতা। সীতা তো ঊর্মিলার বাবার ঔরসজাত সন্তান নন। তাহলে কেমন করে ঊর্মিলার জন্য সীতার মায়া হবে? রক্তের টান বলে তো একটা কথা আছে। তাইতো স্বামী আর দেবর নিয়ে সীতা তাকে এভাবে ফেলে রেখে বনে চলে যেতে পারলেন। তার রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে সেই মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি তাই আজ ঊর্মিলাকে যেতে বলছেন। ভরতের নেতৃত্বে আজ রাজমাতারা যাবেন রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে।

ঊর্মিলাও সবার সাথে চললেন এই ভরসায় যদি রাম ফিরে আসেন তাহলে তিনিও তার সুবর্ণকান্তি স্বামীদেবতাটিকে ফিরে পাবেন। তাই আজ পথ চলতে তার অন্যরকম আনন্দ। স্বর্ণরথে নয় পায়ে হেঁটে যেতে তার ইচ্ছে করছে। কারণ ক'দিন আগে তার প্রিয়বল্লভ এইপথ দিয়েই তো হেঁটে গেছেন।

একদিন পর সৈন্যসামন্ত ও প্রজাদের নিয়ে ভরতবাহিনি সেই অরণ্যে পৌঁছলেন। অরণ্যে রাম-লক্ষ্মণ কুঠির বানিয়ে নিয়েছেন। ঊর্মিলার মনে হল, সেখানে একজন ভোগী গৃহস্থের মতই রাম-সীতার বসবাস। রাজসিংহাসন ও আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এলেও এখানে প্রিয়তমা পত্নীর অবিরাম সাহচর্যে তার মহামহিম ভাসুর মহোদয়ের দিনকাল তো খারাপ কাটছে না। আর এখানে ভ্রাতৃ ও ভ্রাতৃবধু-ভক্ত গৌরাঙ্গ লক্ষ্মণের দিন কাটছে তাঁদের জন্য আহার্য সংগ্রহ করে। পাশাপাশি তাঁদের নিরাপত্তার দিকটা দেকভালের দায়িত্বও 'দায়িত্ববান' লক্ষ্মণেরই কাঁধে অর্থাৎ প্রতিরক্ষা আর খাদ্য এই দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় তাঁকেই সামলাতে হচ্ছে। শুধু তাকেই দেকভাল করার ও সঙ্গ দেবার নেই কেউ।

রাজমাতাদের সঙ্গে দু'একটি প্রয়োজনীয় কথা বললেন লক্ষ্মণ। কিন্তু ঊর্মিলার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। অথচ ঊর্মিলা তাঁকে বারবার সতৃষ্ণ নয়নে দেখছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের মধ্যে কোন বিকার দেখা গেল না। তিনি রামের সঙ্গে রাজমাতাদের প্রণাম করলেন। তিনি ইচ্ছে করলে ঊর্মিলাকে বনান্তরালে ডেকে নিয়ে আদর করতে পারতেন, নিদেন পক্ষে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে পারতেন।

শেষ পর্যন্ত ঊর্মিলার আশংকাই সত্যি হল। রাম ফিরে আসতে রাজি হলেন না। লক্ষ্মণ তাকে সমর্থন করলেন। আশাহত হৃদয়ে ঊর্মিলা রাজপ্রাসাদে ফিরলেন। চৌদ্দটি বছর চাট্টিখানি কথা নয়।

রাজপ্রাসাদে এসে ঊর্মিলা লক্ষ্মণের নিরাপত্তার জন্য ব্রত পালন শুরু করলেন। সোনার পালঙ্ক ছেড়ে তৃণশয্যায় শয়ন করলেন। স্বল্পাহারী হয়ে জীবন-যাপন করতে লাগলেন। সবকিছু পরিত্যাগ করলেও কিছু স্বর্ণালংকার তিনি পরিত্যাগ করলেন না। কারণ এ ভূষণ যে তার স্বামীদেবতা লক্ষ্মণের সোনার অঙ্গের প্রতীক।

কাহিনিসূত্র

০১. রামায়ণী প্রেমকথা, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, আদিত্য প্রকাশালয়, কলকাতা। অক্টোবর, ১৯৬১।

০২. বাল্মিকী রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত। ভারবি। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৭।

০৩. পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত। এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। সপ্তম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৬।

হিমাদ্রিশেখর সরকার

প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ছোটগল্পকার

ভ্রমণ

অপরূপ সৌন্দর্যের ভূস্বর্গ কাশ্মীর

হাবিবুর রহমান স্বপন

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভূস্বর্গ কাশ্মীর সম্পর্কে জানা ও দেখার ইচ্ছা সেই স্কুল জীবন থেকে। বইয়ের পাতায় কাশ্মীরের দৃষ্টিনন্দন নৈসর্গিক নয়নাভিরাম শোভার বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হতাম আর মনে মনে স্বপ্ন পোষণ করতাম আহ্ যদি চোখে দেখতে পারতাম অপরূপ কাশ্মীর তা হলে জীবনটা সার্থক হত। আমার সেই লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল গত মার্চের শেষ সপ্তাহে।

কাশ্মীর অনেকগুলি নামে পরিচিত। যেমন– ঋষিভূমি, যোগীস্থান, শারদাপীঠ বা শারদাস্থান ইত্যাদি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দেয়া 'ভূস্বর্গ' নামটিই সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করেছে। কাশ্মীরকে বলা হয় সুখী উপত্যকা।

পুরাকাল থেকেই কাশ্মীরের কাহিনি শুনে আসছে জনগণ। মহাভারতে কাশ্মীরের আখ্যান মেলে। নানান কিংবদন্তী আছে কাশ্মীরকে ঘিরে। হিন্দু পুরাণে বর্ণনা আছে, প্রজাপতি কশ্যপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সাহায্য নিয়ে জলোদ্ভাব অসুরকে বধ করে কাশ্মীরে রাজ্য গড়েন। ধারণা করা হয়, অতীতে কাশ্মীর ছিল জলমগ্ন। নাম ছিল সতীসর অর্থাৎ সতীর (পার্ব্বতী) সরোবর। সতীসর ছিল দৈত্যপুরী।

দৈত্যদের হাত থেকে নিষ্পেষিত মানবসন্তানদের দুর্দশা মোচনে এগিয়ে এলেন ভগবতীর বরপুষ্ট ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি ও কলার পুত্র মহামুনি কশ্যপ। সকল দৈত্যকে হত্যা করে গড়ে তোলেন লোকালয়। কশ্যপ মার বা কশ্যপ মীর (পাহাড়) থেকেই নাকি কাশ্মীর নামকরণ। মহামুনি কশ্যপ নাগরাজ তক্ষকের হাতে কাশ্মীর সমর্পণ করে ফিরে যান অযোধ্যাপুরীতে। মহাভারত থেকে জানা যায়, রামের অনুজ ভরত এবং শত্রুঘ্ন কাশ্মীরে এসেছিলেন। সম্রাট অশোক কাশ্মীর করায়ত্ত করেছিলেন। সে কারণেই এখানে সেকালে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কও কাশ্মীরে রাজত্ব করেন।

শিবলিঙ্গ পর্বতমালা আপন জটিল জটারাশিতে বিস্তার করে রেখেছে প্রাচীন গান্ধারভূমিকে। এই এলায়িত বিলম্বিত জটারাশির দুর্গম পথ চলে গেছে হিমালয়ের প্রান্তসীমায়। গৌতমবুদ্ধের সঙ্ঘমিত্রদল এই পথ দিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতির নিত্যকালের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে। চোখ তুললেই দেখা যায়, হিমালয়ের চীরবাসা জটাধারী সন্ন্যাসীর ললাটে যেন কনককান্ত রাজমুকুটের মত রৌদ্রদীপ্ত তুষারচূড়া!

কাশ্মীরের অরণ্যঅটবীর ধ্যানগম্ভীর শোভা মানুষের দুই চক্ষুকে বিহ্বল বিস্ময়ে বিমূঢ় করে রাখে। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সুন্দর মসৃণ পথ চলে গেছে দূর-দূরান্তে। পথের দুই পাশে অধিত্যকার সৌন্দর্যে যেন মহাকাব্যের আভাস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে!

কাশ্মীরের বড় অংশ (দুই-তৃতীয়াংশ) ভারতের অধিভুক্ত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কাশ্মীরে ছিল স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৭-এ ভারতের সঙ্গে একীভূত হয় কাশ্মীর। এই অংশের নাম জম্মু ও কাশ্মীর। পাকিস্তানের অংশে আজাদ কাশ্মীর (নামে 'আজাদ' হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়)। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। প্রধান ভাষা উর্দু, ডোগরি, লাডাকি, বালতি, পাঞ্জাবি, হিন্দি, কাশ্মীরি এবং ইংরেজি। এখানে গুজর, পাঠান, শিখ প্রভৃতি নানা জাতির বসতি থাকলেও মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য।

কাশ্মীরে বেড়ানোর জন্য ভাল সময় মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। তাপমাত্রা মার্চের শেষ দিক থেকেই বাড়তে থাকে। ১৩ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বেড়ে ২৭ ডিগ্রিতে ওঠে। মে-জুনে কাশ্মীরে সাধারণ সোয়েটার হলেই চলে তবে শীতে ভারী উলেনের সঙ্গে ওভারকোট দরকার হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকাল। একারণেই এই সময় পর্যটনের অফ সিজন। এসময় হোটেল বা আবাসে ভাড়াও কম।

মার্চের শেষ সপ্তাহ। বাংলাদেশ থেকে লায়ন্স ক্লাবের ১৩০ সদস্যের দল কাশ্মীর ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত। সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন তখন বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন বেবী ইসলাম জানালেন, আমি ইচ্ছা পোষণ করলে তাদের দলের সঙ্গে ভ্রমণে যেতে পারি। তবে শর্ত কলকাতা গিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে, নতুন কেউ (যেমন আমি) দলভুক্ত হতে পারবে কি-না। কারণ কলকাতা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত ২৬ মার্চের বিমানের টিকিট নিশ্চিত করতে হবে। পাবনার পাইওনিয়ার লায়ন্স ক্লাবের ২৭ সদস্যের সঙ্গে সকাল সাড়ে সাতটায় বাস যোগে পাবনা থেকে বেনাপোল সীমান্ত হয়ে বিকাল ৫টায় কলকাতায় পৌঁছলাম। অন্যরা ঢাকা থেকে কেউ বিমানে কেউ-বা বাসে কলকাতায় পৌঁছন বিকেল ও রাতে। সন্ধ্যায় দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকার* চিফ রিপোর্টার বন্ধুবর দেবদূত ঘোষঠাকুরের সহযোগিতায় কলকাতার একটি ট্রাভেলিং এজেন্টের মাধ্যমে বাড়তি ভাড়ায় শ্রীনগরের টিকিট সংগ্রহ করা গেল। অনিবার্য কারণে ৪জন তালিকাভুক্ত লায়ন যথাসময়ে ভ্রমণে যেতে না পারায় আমার দলভুক্তি সহজ হল। ফি. ম. আরেফিন-এর নেতৃত্বে আমরা পরদিন কলকাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে রওনা হলাম শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে। দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছতে সময় লাগল উড়ানের দু'ঘণ্টা। দিল্লি বিমান বন্দর থেকে বিমান পরিবর্তন করে শ্রীনগর বিমান বন্দরে আমরা পৌঁছলাম বিকেল চারটায়। সময় লাগল এক ঘণ্টা দশ মিনিট। যেহেতু বিরাট দল, তাই একটি বিমানে আমাদের টিকিট পাওয়া যায়নি। চারটি বিমানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাত্রা করে সকলে রাতে একত্রিত হলাম হোটেলে। তিন দফা ব্যাগ তল্লাশী হল তিন বিমান বন্দরে। কাশ্মীরে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা চোখে পড়ল।

কাশ্মীরে খুবই সংক্ষিপ্ত সফর ছিল আমাদের। ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ। একটি অঞ্চল সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে পায়ে হাঁটা ছাড়া জানা-বোঝা যায় না। কথায় বলে, পায়ে হাঁটা ছাড়া ভ্রমণ সিদ্ধ হয় না; প্রতি পদক্ষেপে ভূমিকে স্পর্শ করা– সেটিই ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। পা চলে এবং মন তার সঙ্গে কাজ করে। গতি যত ধীর, বিশ্রামের ছেদ যত বেশি, ভ্রমণ ততটাই সার্থক। যত বেশি পরিমাণ দেখা, তত বেশি দর্শন। যত জানা তত জ্ঞান।

গ্রীষ্ম আসন্ন তাই তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। বরফ গলতে শুরু করেছে। এর মধ্যে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টির চেয়ে কাশ্মীরের চাষীরা আকাশের দিকে বেশি চেয়ে থাকে তুষারপাতের জন্য। অতিশয় তুষারপাত মানেই ফসলের প্রাচুর্য। বরফ গলা পানি ছুটছে নালায়, প্রণালায় এবং ঝিলাম, বিতস্তা, শাখাসিন্ধুর বিভিন্ন খালবিলে। এই পানিই ব্যবহৃত হবে ফসলের জন্য সেচ কাজে। পাহাড়ে-মাঠে-গ্রামে ফলবান ঐশ্বর্য যেন ঝলমল করে। বাসে পথ চলতে চোখে পড়ে গ্রামে গ্রামে নিরীহ, মন্থর ও নির্লিপ্ত জীবনযাত্রা। ধান প্রধান ফসল। এছাড়াও আবাদ হয় ভুট্টা, সরিষা, কাংনি, আমারান্থ। 'কাংনি' ভাতেরই মত। 'আমারান্থ' অতি সুস্বাদু দানা, কাশ্মীরিরা দুধসহযোগে খায়। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বিশেষ করে এইগুলি খেয়ে 'একাদশী' পালন করে। আমাদের দেশে যেমন কাউন হয়। অনেকটা তেমনই। সরিষা আবাদ হয় প্রচুর পরিমাণে। আমাদের উড়োজাহাজটি শ্রীনগর বিমান বন্দরে অবতরণের সময় রানওয়ে ফাঁকা না পাওয়ায় দু'বার চক্কর দিল ৫০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী কাশ্মীর উপত্যকায়। বিমানের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন, যেহেতু রানওয়ে ফাঁকা নেই, তাই আমরা কাশ্মীর ভ্যালির উপর দিয়ে চক্কর দেব। আপনারা সৌভাগ্যবান, আপনারা কাশ্মীর ভ্যালির অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারবেন। নিচের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম মাঠভর্তি হলুদ ফুলেভরা সরিষা খেত। বরফে ঢাকা খিলানমার্গের পাহাড়চূড়ায় সূর্যের কিরণ পড়ে রূপালি দ্যুতি ছড়াচ্ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর। শীতকালের রাজধানী জম্মু। ডাল লেক এবং ঝিলাম নদী শ্রীনগরের দুই হৃৎপিণ্ড। ১৭৬৮ মিটার উঁচুতে প্রায় ১১৪ বর্গ কিলোমিটার উপত্যকা জুড়ে লেক ও বাগিচায় সুশোভিত আধুনিক শহর শ্রীনগর। ঝিলাম নদীর উত্তর-পশ্চিম এলাকাজুড়ে শহর। শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে ঝিলামের দক্ষিণ দিকে। শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১২ লাখ। শ্রীনগরকে ভর করেই পর্যটকদের ভ্রমণ তালিকা তৈরি হয়। সম্রাট অশোক আধুনিক শহরের গোড়াপত্তন করেন।

শীতপ্রধান কাশ্মীরের নারী-পুরুষ সবাই আলখেল্লা পরিধান করে। যাকে বলা হয় ফেরন। ফেরন উলেন কাপড়ে তৈরি হয়। শ্রীনগরের অন্যতম আকর্ষণ কাশ্মীরসুন্দরী ডাল লেক। লাকুতি ডাল, গাগরিবাল, বড়া ডাল– এ তিনের সমন্বয়ে ডাল লেক। পাশেই নাগিন। এটি ডালের অংশ হলেও ভাসমান উদ্যান এটিকে পৃথক করেছে। ডালের দৈর্ঘ্য ৬ কিমি এবং প্রস্থ ৩ কিমি। এই ডালকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে পর্যটন বিনোদনের কাশ্মীরি ব্যবস্থা। ডালের গভীরতা ৫ থেকে ২৫ ফুট। অতীতে ব্রিটিশদের কাশ্মীর ভূখণ্ডে স্থান দেওয়া হত না। তখনই ব্রিটিশরা পানিতে বাস করার জন্য বড় বড় নৌকায় থাকত। এগুলোর নাম 'হাউজ বোট'। ১৮৮৮ সালে হাউজ বোটের জন্ম। ডাল লেকের কারণেই শ্রীনগরকে প্রাচ্যের ভেনিস বলা হয়। পাড়ের সঙ্গে সংযোগ রাখতে ছোট ছোট বোট ব্যবহৃত হয়। যার নাম শিকারা। ডাল লেকের ডান পাড় বরাবর অনেক আবসিক হোটেল। ডালের দক্ষিণে শঙ্করাচার্য এবং পূর্বদিকে হরি পর্বত যেন প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। আর পশ্চিমে বিখ্যাত হযরতবাল মসজিদ। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া হাউজবোটই এখন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। কাশ্মীরের শ্রীনগর এসে হাউজ বোটে রাত কাটানোয় ভ্রমণে বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। হাউজ বোটে রাত না কাটালে যেন কাশ্মীরভ্রমণই বৃথা।

বিমান বন্দর থেকে বাসযোগে আমরা বিকাল সাড়ে চারটায় পৌঁছলাম শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি আবাসিক হোটেলে। বাক্স-পেটরা হোটেলকক্ষে রেখে চা-নাস্তা করে বিশ্রাম। আমার কক্ষে দন্তবিশারদ ডা. মনোয়ার-উল আজীজ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান মোফাকখার হোসেন মাসুম। পাশের কক্ষে আবুল হোসেন কালু, ইউনুস আলী এবং মঞ্জু ভাই। আমাদের হোটেলকক্ষের জানালা দিয়ে পাহাড়চূড়া দেখা যাচ্ছিল। এটির নাম হরি পর্বত। পর্বতের শীরে ১৫৮৬ সালে মোগল সম্রাট আকবরের তৈরি দুর্গ। ১৮১২ সালে পাঠান শাসক আট্টা খান এটির সংস্কার করেন। বিকেলের চা-নাস্তা শেষ করেই একটি বাসে চেপে দর্শনীয় স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখনও আমাদের দলের অনেকেই পরবর্তী বিমানে শ্রীনগরের পথে। ডাল লেকের দক্ষিণ পাড়ে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের পাদদেশে জওহরলাল নেহরু পার্কের একাংশে ইন্দিরা গান্ধী টিউলিপ গার্ডেন। বাগানে প্রবেশ করলাম ৫০ রুপিতে টিকিট কেটে। ডাল লেকের গাগরিবাল অংশেই হাউজ বোটে ব্রিটিশরা জওহরলাল নেহরুকে বন্দী করে রেখেছিল। সারিসারি নানা রংয়ের টিউলিপ ফুটে আছে। প্রচুর দর্শক। আমরাও দেখলাম এবং ছবি ওঠালাম। ফর্সা ও উন্নতনাসা মেদহীন দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী কাশ্মীরিকন্যাদের দেখলাম টিউলিপ গার্ডেনে। পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও মাথায় স্কার্ফ এবং সালোয়ার কামিজ পরা স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা শিক্ষকদের নেতৃত্বে দল বেঁধে টিউলিপ দর্শনে এসেছে।

টিউলিপ বাগান থেকে বের হয়ে যখন বাসে উঠলাম, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ডাল লেকের দক্ষিণ পাড়-বরাবর সড়ক ধরে সোজা পশ্চিমে। প্রায় ১৫ মিনিট পরই ডাল লেকের পশ্চিম পাড়ে ৭ কিমি দূরে অবস্থিত কাশ্মীরের মুসলমানদের কাছে পবিত্র হযরতবাল মসজিদে পৌঁছলাম। এখানে সংরক্ষিত আছে নবী করিম (সঃ)-এর শ্মশ্রু। মোগল ও কাশ্মীরি স্থাপত্যে ত্রিস্তরের ছাদে সফেদ রঙের অটোমান শৈলীর গম্বুজ মাথায় নিয়ে বিশাল হযরতবাল মসজিদ। মোগল সম্রাট শাহজাহানের সময় ১৬৪২ সালে এটি তৈরি হয়। পরে সংস্কার করা হয় মার্বেল পাথরে। মসজিদের পিছনের দিককার প্রবেশপথটি পুরনো শহরের দিকে খোলা। সেদিকটা অপরিচ্ছন্ন, দোকানপাট ও বসতিপূর্ণ। একটি কক্ষে কাচের আধারে রক্ষিত আছে হযরত (সঃ)-এর কেশ মোবারক। এখানে বসানো হয়েছে সশস্ত্র পুলিশী চৌকি। সপ্তাহে একদিন শুক্রবার এটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই কেশ চুরি হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৬৪ সালে দাঙ্গা বাধে কলকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি, খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানে। ক'দিন পরে কে বা কারা যথাস্থানে কেশগুচ্ছ রেখে যাওয়ায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। ডাল লেকের উত্তর পারের সড়ক পথ ধরে আমরা হোটেলে ফিরলাম। পথের ধারে দেখলাম কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি। বড়বাজার লালচকের ভেতর দিয়ে আমাদের বাস যখন অতিক্রম করছিল তখন রাত সাড়ে ৮টা, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

পরদিন সকালে নাস্তা করে সাড়ে নয়টায় সোনামার্গের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হল। ইংরেজরা উচ্চারণ করত সোনমার্গ। এখন এই এলাকার মানুষজনও সোনমার্গ বলে থাকে। দূরত্ব ৮১ কিমি। শ্রীনগরের উত্তর-পূর্ব দিকের এই দর্শনীয় স্থান সোনামার্গ ২৭৪০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। খরস্রোতা দামাল সিন্ধু নদীর পাড় বরাবর সারিসারি ফার, পাইন আর বার্চ বৃক্ষ দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম গগনগের। গগনগের থেকে সোনামার্গের দূরত্ব ৯ কিমি। বাস থেকে সেখানেই নামতে হল আমাদের, কারণ বাস পাহাড়ি পথে যাবে না। ৯ কিমি পথ অতিক্রম করে সোনামার্গে যেতে হবে জিপে। জানা গেল এখানে স্থানীয় জনসাধারণ যারা পর্যটকদের ওপর নির্ভর করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে, তারা সম্মিলিতভাবে নিয়ম করে নিয়েছেন বাস সোনামার্গ পথে যাবে না। এই পথে তাদের জিপ চলবে। জিপে পর্যটকরা যাবে, তাতেই তাদের আয়-উপার্জন। সোনামার্গ থেকে কার্গিলের দূরত্ব ১১৯ কিমি। বালতাল ১৫ কিমি; গুমরির দূরত্ব ২৩ কিমি এবং দ্রাস-এর দূরত্ব ৬২ কিমি। বরফে ঢাকা শৈলশহর লেহ্-র দূরত্ব ৩৪৫ কিমি। এই পথেই মহামতি গৌতমবুদ্ধ মধ্য এশিয়ায় গমন করেছিলেন। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থভূমি অমরনাথ যেতে হয় এ পথেই। চারপাশ পাহাড় ঘেরা, সোনালি ঘাসে ঢাকা সোনামার্গ। প্রবাদ আছে, এই উপত্যকায় কোথায়ও একটি কূপ আছে যার পানির রঙে রাঙা এই উপত্যকা। একারণেই নাম সোনামার্গ অর্থাৎ সোনালি বাগিচা। স্বাস্থ্যকর স্থান। জওহরলাল নেহরুর প্রিয় স্থান ছিল সোনামার্গ।

সোনামার্গে যাওয়ার পথে আমরা অতিক্রম করলাম কংগন, গুন্দ, ওয়াংগৎ প্রভৃতি জনপদ। চোখে পড়ল মেষপাল। ছাগলের চেয়ে ভেড়ার সংখ্যা বেশি। এখানকার ভেড়ার লেজ বড় এবং শরীর ঘন লোমে ঢাকা। ভেড়ার লোমে শীতবস্ত্র তৈরি হয়। লোম কাটা হয় গ্রীষ্মকালে। সুশ্রী, সৌম্য ও দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যকায় বালক-বালিকারা সংখ্যায় তিনজন, চারজন বা তারও বেশি লাঠি হাতে মাঠের মধ্যে ভেড়ার দলকে সামলাচ্ছে। ওরা গুজর সম্প্রদায়ের মুসলমান। ওদের নিজস্ব ভাষা 'পরিমু'। অমরনাথের গুহায় শিবলিঙ্গটি হিন্দুদের কাছে মহাপবিত্র পূজনীয়। কথিত আছে যে, বরফে আচ্ছাদিত ফোয়ারার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শিবলিঙ্গটির আবিষ্কারক ছিল একজন গুজর মুসলমান। যেহেতু মুসলমান এটির আবিষ্কারক তাই এখানে প্রবেশাধিকারে মুসলমানদের বাধা নেই।

সোনামার্গের এই পথটি অতি প্রাচীন। সিন্ধু নদীর শাখা চন্দ্রভাগা এখানে হিমালয়ের দুই বিশাল চূড়াকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রেখেছে। একটির নাম হরমুখ, অপরটি কোলাহই। দুই উত্তুঙ্গ গিরিশীর্ষের ঠিক মাঝখান দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব-উত্তরদিকে পথ চলে গেছে সোনামার্গ হয়ে জোবিলার দিকে। অন্য পথটি গেছে পশ্চিম থেকে উত্তর গিরিলোকের ভিতর দিয়ে। এই পথেরই মাঝপথে পড়ে বড় জনপদ মিনিমার্গ। দুর্ধর্ষ 'দার্দ' এবং 'বমবাস' উপজাতির বসবাস এখানে। যারা এখনও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। এটি দার্দিস্থান নামে পরিচিত। কংগন থেকে সোনামার্গের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেই বোঝা যায় পথ সংকীর্ণ হচ্ছে। দুই দিক থেকে গিরিশ্রেণী গায়ে-গায়ে এসে লাগছে। খোলা মাঠ আর নেই। কাশ্মীরের জগৎপ্রসিদ্ধ সমতল উপত্যকা সোনামার্গের নদীপ্রান্তে এসে শেষ হয়েছে। প্রায় দুই হাজার বর্গমাইলের এই উপত্যকা। কিন্তু পৃথিবীর পরমাশ্চার্য এই ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্ববাসীর কাছে চিরকালের আকর্ষণীয়। সোনামার্গ যাওয়ার দুই কিলোমিটার আগে উঁচু মালভূমিটির নাম 'থাযওয়াজ'। অপরূপ আরণ্যকসৌন্দর্য এই স্থানটির। সুবৃহৎ হিমবাহ গলে নদীর সৃষ্টি করেছে থাযওয়াজে। দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা গগনগের-এর স্নো হাইটস্ রেস্টুরেন্টে। খাবার পর বাইরে এসে দাঁড়াতেই একপশলা বৃষ্টি। দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে শীতল বাতাস এসে ঝাপটা দিয়ে আরও শীত লাগিয়ে দিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করলাম। আধা ঘণ্টা পর বাতাস কমল। রোদ উঠল। আমরা রোদে দাঁড়ালাম। পাশের দোকানে শীত বস্ত্র কেনা-কাটা করলেন অনেকে। সামনেই পাহাড় থেকে প্রবল বেগে নেমে আসা পানির স্রোতধারা। তার ওপর একটি সেতু। সেতু পার হয়ে বরফাচ্ছাদিত পাহাড় দেখতে ঘোড়ায় চড়ে দর্শনার্থীরা চলেছে। আমার সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসমত, মনোয়ার আজীজ, আবদুস সবুর, রশিদুল হাসান আজম, আবদুর রহমান, শাহীন রহমান, ফরিদ সনম সেতু পার হয়ে দেখে এলেন বরফে ঢাকা পাহাড়ের কিছু অংশ। নানা রঙের পাহাড়ি ফুল ফুটে আছে পাথরের গায়ে। আমাদের সফরসঙ্গী চটপটে কিশোর আকিব ও আবিদ ক্যামেরা চালিয়ে আমাদের ছবি ওঠাচ্ছিল।

সোনামার্গ থেকে ৬ কিমি দূরে বাল্টিকদের কলোনি। নীলাগ্রাদ নামের এই জায়গায় পাহাড়ি বড় নালা সিন্ধু নদীতে মিলেছে। এখানকার পানির রং রক্তিম। বাল্টিকদের কাছে এটি পবিত্র নদী। তাই ওরা প্রতি রবিবার এখানে স্নান করে। তাদের ধারণা এই পানিতে স্নান করলে রোগ মুক্ত থাকা যায়। নীলাগ্রাদের দুর্গম পথ অতিক্রম করার জন্য যে সময় দরকার তা আমাদের হাতে ছিল না তাই সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

পরদিন সকালে আবারও কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনের জন্য আমাদের যাত্রা। এবারের গন্তব্য গুলমার্গ। শ্রীনগর থেকে বারমুল্লার পথে বাম দিকের পথ গেছে গুলমার্গে। ধান ও ভূট্টা খেতের মাঝ দিয়ে যাওয়া সড়কপথের দু'ধারে পপলার গাছের সারি। শ্রীনগর থেকে দূরত্ব ৪৬ কিমি। ৮ কিমি আগেই ২৫৩০ মিটার উচ্চতায় ট্যাংমার্গে বাস থেমে গেল। এখানেও সেই একই অবস্থা। পরবর্তী ৮ কিমি পথ যেতে হবে জিপে। পর্যটকদের আয়ে জিপ মালিক, চালক, সহকারী ও দালালদের সংসার চলে। শীত বা ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে প্রত্যেককেই সংগ্রহ করতে হল জ্যাকেট, ওভার কোট এবং বুট। বরফের ওপর সূর্যকিরণ পড়ে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় তা থেকে চোখ বাঁচাতে কিনতে হল রোদ চশমা (সান গ্লাস)। পীরপাঞ্জালের পাহাড় ঢালে বরফাচ্ছাদিত গুলমার্গ। উচ্চতা ২৭৫০ মিটার। দূর-দূরান্তে যতদূর চোখ যায় শুধু শ্বেত-শুভ্র বরফ আর বরফ। অতীতের গৌরিমার্গ এখন গুলমার্গ। শিব-জায়া গৌরির নামে নাম। ১৫৮১ সালে কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফ শাহ নামটি বদলে রাখেন গুলমার্গ। ফার্সি শব্দের অর্থ ফুলের উপত্যকা। গ্রীষ্ম ও বসন্তে দেশি-বিদেশি ফুলের সমারোহ ঘটে ৩ কিলোমিটারব্যাপী গুলমার্গে। এখানে স্কী খেলা শেখার স্কুল এবং বিশাল গল্‌ফ কোর্স রয়েছে। পাইন আর দেবদারুতে ছাওয়া নৈসর্গিক শোভার তুলনা হয় না। গুলমার্গ থেকে পায়ে হেঁটে ৬ কিমি দূরে ১১ হাজার ফুট উঁচুতে খিলানমার্গ। বিশ্বের পঞ্চম উচ্চ (৮৩৮১ মিটার) তুষারাচ্ছাদিত নাঙ্গাপর্বত। এখানে কোন বসতি নেই। আছে সেনা চৌকি। রোপ ওয়েতে 'কেবল কার'-এ চড়ে বরফাচ্ছাদিত পাহাড় চূড়া দর্শন করতে হয় দর্শনীর বিনিময়ে। এই রোপওয়ে থেকে হরমুখ, ত্রিশূল, গৌরিশঙ্কর, উলার, শঙ্করাচার্য পাহাড় ও শ্রীনগরের ডাল লেক দেখা যায়। পথশ্রান্তির ক্লান্তি দূর হয় এর নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে। ট্যাংমার্গের কনফেকশনারিতে তৈরি বিস্কুটের স্বাদ নিতে ভুল করিনি। দারুণ স্বাদের নানা ধরনের বিস্কুট তৈরি করে এখানকার কারিগররা। দাম বেশি। কারণ বিস্কুট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে কাজু, এলমন্ড, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি।

গুলমার্গের কথা বহুদিন মনে থাকবে। কারণ এখানেই আমাদের সহযাত্রী ডা. মধুসূদন বিশ্বাসের স্ত্রী রত্না বিশ্বাসের ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন ট্যাংমার্গ থেকে গাড়ি বদল করে গুলমার্গে যাই তখনই ব্যাগটি হারিয়ে যায়। জিপের মধ্যে রেখে যান ভুলবশত। কারও কাছে জিপটির নাম্বার ছিল না। প্রায় তিন ঘণ্টা পর আমরা যখন গুলমার্গ থেকে নেমে ট্যাংমার্গে ফিরে এলাম, তখনই জিপের চালক মারাঠি যুবক মো.জায়েদ হোসেন বেগ এসে ব্যাগটি ফেরত দিলেন। ব্যাগে কয়েকশো ডলার, ভারতীয় রুপী এবং বাংলাদেশী টাকা ছিল। জায়েদকে পুরস্কৃত করা হল।

কাশ্মীরিদের সততা সম্পর্কে যথেষ্ট খ্যাতি থাকলেও পণ্য ক্রয়ের সময় দাম-দর করতে হয়। দোকানপাট, হোটেল, হাউজবোট সর্বত্রই এই নিয়ম বা প্রথা। সর্বত্রই দালাল আছে। সতর্ক থাকতে হবে। দালালরা কল্পলোকের গল্প শুনিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে। ওরা কমিশন পায়। দালাল প্রস্থান করার পর গল্পকথার সঙ্গে বাস্তবের অমিল হলে সংঘাতে পীড়ন বাড়ে যাত্রীর। কাশ্মীরের সুচিশিল্পের সুষমামণ্ডিত চর্ম, পশমজাত নয়নলোভন পশমিনা, শাল, সিল্ক, কার্পেট ও ওক কাঠের আসবাবপত্র চোখ ধাঁধানো সূক্ষ্ম হাতের কাজের জুড়ি মেলা ভার। এছাড়াও নানা প্রকার হস্তশিল্পের মনোমুগ্ধকর দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কাশ্মীরের মধু'র সুখ্যাতি রয়েছে। সরিষা ফুল, আপেল ও আখরোট ফুল, গাঁজা ফুল, পপি ফুল এবং নানা প্রকার পাহাড়ি ফুলের মধু পাওয়া যায়। পর্যটকদের কাছে শীতবস্ত্রের পরই মধুর কদর।

আখরোট, কাজুবাদাম এবং এলমন্ড বা কাঠ বাদাম কাশ্মীরিদের অন্যতম খাবার। দোকানে বস্তা ভর্তি আখরোট সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ফল বিশেষ করে সুমিষ্ট আপেল তাদের প্রিয় খাবার। কাশ্মীরে আপেল পাওয়া যায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমরা

বাজারে আপেল পাইনি। ভেড়া ও ছাগলের মাংশ পাওয়া যায় হোটেলে। তবে স্থানীয়দের বেশিরভাগই নিরামিষভোজী। ছানা ও পনিরের সবজি প্রিয় খাবার। খাবারের পর মিষ্টিমুখ করার অভ্যাস কাশ্মীরিদের পূর্বপুরুষ থেকেই। পায়েস, সেমাই, সুজি ইত্যাদিতে দুধ, জাফরান, কাজু বাদাম, আখরোট, এলমন্ড গুঁড়া মিশিয়ে তাতে পরিমিত মিষ্টি দেওয়া হয়। কাশ্মীরি পোলাওয়ের কদর বিশ্বব্যাপী। এই অঞ্চলে উৎপন্ন সহজলভ্য মশলায় মাখন অথবা ঘি দিয়ে রান্না হয় কাশ্মীরি পোলাও।

পরদিনের গন্তব্য কাশ্মীর উপত্যকার সুন্দরতম পাহাড়ি শহর পহেলগাঁও। যেহেতু সেখানে রাত্রিযাপন, তাই বাক্স-পেটরা নিয়ে যাত্রা করতে হল। শ্রীনগর থেকে ৯৪ কিমি দূরে ২১৯৫ মিটার উঁচুতে লিডার নদীর তীরে পাইন-চিনার-দেবদারুতে ছাওয়া রূপসী শহর পহেলগাঁও। শ্রীনগর থেকে ১৩ কিমি দূরে পহেলগাঁও-এর পথে পামপুর। এখানেই জাফরান আবাদ হয়। সড়কের দু'পাশের সমতল জমিতে জাফরান চাষ হয়। পীতাভ সোনালি আভার ফুল ফোটে জাফরানের, অক্টোবর মাসে খেত ভরে যায় ফুলে। স্পেন এবং পামপুরের জাফরান সবচেয়ে ভাল মানের। বৌদ্ধ সন্যাসীরা কাশ্মীরে জাফরান চাষ শুরু করে। প্রতি গ্রাম জাফরানের দাম দুশো রুপি। আমাদের বাস থামল পামপুরে। এখানকার পর্যটন পরিবহনের বাস, জিপের চালকদের সঙ্গে দোকানদারদের কমিশন প্রাপ্তির যোগসূত্র থাকায় একটি দোকানের সামনে বাস থামল। আমরা জাফরান, আখরোট, কাজু বাদাম, শাহী জিরা, শিলাজিৎ কিনলাম। শিলাজিৎ হচ্ছে এক ধরনের হারবাল ওষুধ। যার জন্ম পাহাড়ের শিলাখণ্ডের ভেতরে। শিলাজিৎ ঘন কালো তরল পদার্থ। শুদ্ধ ভাষায় শিলাজতু। বহু উঁচু পাহাড়ের উপর কালো পাথরের অঙ্গ থেকে নিঃসৃত হয়। এটি বহু গুণবিশিষ্ট এক প্রকার হারবাল ওষুধ। সব অসুখেরই প্রতিষেধক বা সর্বরোগের মহৌষধ। রোগ নিরাময়ের কল্পতরু। পাহাড়িরা বলে, পর্বতের স্বেদ। দশ গ্রাম শিলাজিৎয়ের দাম দেড় হাজার রুপি।

পহেলগাঁওয়ের পথে সমতল ভূমি ছাড়িয়ে যতই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম ততই অবাক হচ্ছিলাম। আখরোট এবং আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে আমাদের চারটি বাস সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। আখরোট এবং আপেল গাছে প্রচুর ফুল ফুটেছে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ফল উঠবে। তখন জমজমাট হবে বিকি-কিনির বাজার। পামপুর থেকে ১৬ কিমি অগ্রসর হয়ে অবন্তীপুর। ৮৫৫ খ্রি. থেকে ৮৮৩ খ্রি. পর্যন্ত এটি ছিল কাশ্মীরের রাজধানী। তারপর আরও ২১ কিমি এগিয়ে খানাবল। এখান থেকে এক কিমি সামনে গিয়ে ডান দিকে আরও এক কিমি গেলেই অনন্তনাগ। পাহাড় থেকে ঝর্না নামছে, দু'পাশে দুটি কুণ্ড, মাঝে মন্দির; নাগের নামে জায়গার নাম। লোকশ্রুতি আছে, বড় কুণ্ডটিতে বিষ্ণুর শয্যা অনন্তনাগের বাস। প্রচুর মাছ আছে কুণ্ডের পানিতে। একটির পানি ঠাণ্ডা, অপরটির গরম। মন্দিরে পূজা হয় শিব ও রাধাকৃষ্ণের। এখানকার পুরোহিত বাঙালি। বংশ পরম্পরায় তারা পূজার্চনা করে আসছেন। চলার পথে ৩৫ কিমি যেতে সংগ্রামা। এখানে উইলো কাঠের ব্যাট তৈরি হয়। এখানকার কারিগররা কুটির শিল্প গড়ে তুলেছে বহু বছর ধরে। থরে থরে ব্যাট সাজানো রয়েছে শোরুমে। বাস থামিয়ে সস্তায় ব্যাট কিনে নেওয়া যায়। অনন্তনাগ থেকে ২৬ কিমি দক্ষিণ-পূর্বদিকে কোকরনাগ। কোকর অর্থ মুরগি, আর নাগ অর্থ সাপ। অসংখ্য মুরগির পায়ের ছাপ আছে পাহাড়ের গায়ে। আর সেই ছাপ

দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঝর্নাধারা। এই ঝর্নার জল মহৌষধির কাজ করে এমন বিশ্বাস অনেকের। সময়াভাবে আমাদের যাওয়া হয়নি কোকরনাগে। পরে কখনো সুযোগ হলে অদেখা দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখার ইচ্ছা রইল।

লিডার ভ্যালি রোড উঠছে উপরের দিকে। তার দুই দিকে ছবির মত উপত্যকা যেন দুর্বাদলশ্যাম। মাঝে মাঝে বাঁকের মুখে আসছে গিরিখাদ– অথৈ নীচে যেন চলেছে গৈরিকবর্ণা লিডার নদী। শীতলমধুর বাতাস উঠেছে গিরিলোকে। অপরাহ্ন। ঘোড়া নিয়ে চলেছে তার সহিস। পাহাড়ি দুর্গম পথে ঘোড়াই একমাত্র অবলম্বন। ঘোড়ায় চড়ে পর্যটকরা দুর্গম পাহাড়ে আরোহণ করেন। বিনিময়ে সহিস পায় অর্থ। এই অর্থেই তার সংসার চলে। ঘোড়ার মালিকের অনেকগুলো ঘোড়া থাকে। এই ঘোড়াগুলোর যত্ন বা দেখভালের জন্য রয়েছে সহিস। ওরা মজুর। কাজের বিনিময়ে টাকা পায়। কাজ বলতে পাহাড়ে পর্যটকদের দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া। এর বিনিময়ে যা আয় হয় সেটাই ভাগ-বাটোয়ারা হয় মালিক-কর্মচারির মধ্যে।

ফার বৃক্ষে ছাওয়া তুষারাচ্ছাদিত ১২টি শৈলশিখরে ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ি শহর পহেলগাঁও। অপরূপা পহেলগাঁও রূপে অতুলনীয়া। পহেলগাঁও অর্থাৎ পয়লা গাঁও। কারণ জোজি-লা পাস পেরিয়ে লাদাক হয়ে অমরনাথ দিয়ে কাশ্মীর আসার পথে পয়লা গাঁও পড়ে এই পহেলগাঁও। পহেলগাঁও থেকে ৫ কিমি দূরে ১৫০ মিটার উঁচুতে বৈশরণ। যদিও এটি এখন ইংরেজদের উচ্চারণে বাইসরন নামে পরিচিতি পেয়েছে। পাইনে ছাওয়া বরফাচ্ছাদিত বাইসরনকে বলা হয় মিনি সুইজারল্যাণ্ড। এর পাশেই তুলিয়ান লেক। ঘোড়ায় দুর্গম খাড়া পাহাড়ে যখন অগ্রসর হবেন তখন মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেলাম। নিচে পাহাড়ের গভীর খাদের দিকে চোখ পড়লে তো গলা শুকাবেই। বিকেল বেলা– সূর্যাস্ত যেতে তখনো আধা ঘণ্টা বাঁকি। বরফাচ্ছাদিত পাহড়ের চূড়ায় সূর্যকিরণ পড়ে এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এখানে শীতও বেশ। হোটেলকক্ষে প্রবেশের আগে সামনের বিরাট বাজারের দোকানে কেনাকাটা করলেন আমার সফরসঙ্গীদের অনেকেই। উলেন বস্ত্র এখানে বেশ কম দামে মেলে। হোটেলের বাইরে খোলা জায়গায় ভ্রাম্যমাণ দোকান বসেছে। দোকানের প্রায় সবই শীতবস্ত্র। আমরা সকলেই কিছু শীত বস্ত্র কিনলাম। বাইরে খোলা একটি স্থানে জিপ চালকেরা একত্রিত হয়ে 'কাওয়া' পান করছিল। সাফরান (জাফরান) কাওয়া এখানকার এক ধরনের পানীয়। যা চায়ের মত গরম করে পান করতে হয়। গাছের পাতার রস, জাফরান এবং আখরোট-কাজু মিশ্রণে সুস্বাদু পানীয়। আমরা কাওয়া পান করলাম এবং কিনলাম।

পহেলগাঁও থেকে অমরনাথের দূরত্ব ৪৮ কিমি। ৩৮৮০ মিটার উঁচুতে হিন্দু তীর্থস্থান অমরনাথ। বরফে তৈরি শিবলিঙ্গ। বরফ জমে জমে শিবলিঙ্গটি কখনো কখনো ৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। সুকঠিন, উজ্জ্বল বরফের এই লিঙ্গমূর্তি, রঙ তার ঈষৎ নীলাভ। রাতে শীতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকল। হোটেলকক্ষে হিটার চলছে। আছে বেড হিটারও। গরম পানির ব্যবস্থা কাশ্মীরের সব হোটেলেই বিদ্যমান।

আমরা পরদিন পহেলগাঁওয়ের আশে-পাশের দর্শনীয় স্থানে গেলাম। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাইসরন যাওয়ার সাহস আমার না হলেও বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুম ভাই গেলেন। ফিরে এসে তিনি যে দুর্গম খাড়া পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়ে ওপরে ওঠার বর্ণনা দিলেন সে-সব শুনেই আমার শরীর হিম হয়ে এল। অবশ্য আফসোসও হল, না গিয়ে ভুলই করেছি।

দুপুরে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা বাইসরন হোটেলে। বিকেল চারটায় শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে বাস ছুটল। রাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ডাল লেকের হাউজ বোটে। ঘাটে বাস থামল। শিকারায় উঠে বিরাটাকৃতির হাউজ বোটে উঠলাম। ইংরেজ কেনেথ সাহেবের নৌকা এখন হয়েছে হাউজ বোট। ১০ থেকে ২০ ফুট প্রস্থ এবং ৮০ থেকে ১২০ ফুট লম্বা। কার্পেটে মোড়া পরিপাটি করে সাজনো নৌকার শয়নকক্ষ। বসবার জন্য ড্রইং রুম বেশ সাজানো-গোছানো। চারপাশে বারান্দাও আছে। ছাদে ফুলের বাগানে বসবার ব্যবস্থা আছে। প্রায় দেড় হাজার হাউজ বোট রয়েছে এই ডাল লেকে। রাতেই হাউজ বোটের কাছে চলে এল শিকারায় ভাসমান দোকান। ছোট ছোট শিকারায় সব ধরনের নিত্যপণ্য নিয়ে হাজির নারী-পুরুষ দোকানদার। রাতে হাউজ বোটে খাবারের পর নিদ্রা। সকালে আবারও শিকারায় দোকান নিয়ে পণ্য বেচতে এল বেশ কয়েকজন। কাশ্মীর ভ্রমণে হাউজ বোটে রাত্রিযাপনে বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। একারণে যারাই শ্রীনগর আসেন, একরাতের জন্য হলেও ডাল লেকে হাউজ বোটে রাত্রিযাপন করেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কাশ্মীরের মানুষের ধারণা আছে বটে, তবে তা স্পষ্ট না। তারা জানে পাকিস্তান থেকে আমাদের আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র করে। ট্যাংমার্গ, শ্রীনগর, পামপুর, সোনামার্গ এবং পহেলগাঁওয়ে কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে কথা বলে তাই মনে হল। আমরা যখন তাদের বললাম প্রকৃত ঘটনা; কি কারণে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি, তখন তারা বুঝল। তারা অবাক হল, যখন আমাদের কাছে জানল, পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচারের কথা, তখন তারা ঘৃণা প্রকাশ করেছে পাকিস্তানীদের প্রতি। মুসলিম হয়েও পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর জুলুম করেছে, বাড়ি ঘর-দোকানপাট আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, এসব শুনে ওরা পাকিস্তানীদের নিন্দা করল এবং বলল, তারা এসবের কিছুই জানে না। বাংলাদেশী ক্রিকেটদলের ভক্ত স্কুল- কলেজের ছাত্র, দোকানদার, হোটেল কর্মচারি, জিপ ও বাসের চালক-সহকারী, এমনকি ঘোড়ার সহিসও। ওরা সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মোস্তাফিজসহ সব খেলোয়াড়ের নাম জানে এবং তাদের ভক্ত। কাশ্মীরি যুবকেরা ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলাদেশী ক্রিকেটারদের নাম উচ্চারণ করছিল।

কাশ্মীরে যেখানেই আমরা ঘুরলাম সর্বত্রই জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়ল। নিরাপত্তায় কড়াকড়ি আছে, বাড়াবাড়ি নেই। পাহাড় এবং সমতলে সশস্ত্র পাহারা চৌকি নজরে এল। বাসে দীর্ঘ সড়কপথে যখন আমাদের বাস চলছিল ডানে-বামে লক্ষ্য করলাম ফসলের খেতে, দোকান ও বাড়ির ছাদে, পরিখার মধ্যে এবং গাছ বা জঙ্গলের আড়ালে সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনির জোয়ানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ভ্রাম্যমাণ পুলিশের টহল শহরে এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। সাদা পোশাকে নিরাপত্তা বাহিনির সদস্যদের কড়া নজরদারি চোখে পড়ল দুর্গম পাহাড়ে। যেহেতু পর্যটনই কাশ্মীরের অন্যতম আয়ের উৎস তাই পর্যটকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকার বা প্রশাসন যথেষ্ট সজাগ বলেই মনে হল।

৩১ মার্চ সকালে আমরা কিছু কেনাকাটা করে বাসে উঠলাম শ্রীনগর বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে। বিমান বন্দর যাওয়ার এক কিলোমিটার আগেই চেক পোস্টে সকল ব্যাগ (এমনকি হাত ব্যাগও) আধুনিক যন্ত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল। এর পর আবারও শ্রীনগর বিমান বন্দরে তল্লাশী হল সবার বাক্স-পেটরা। রাত সাড়ে ন'টায় আমরা কলকাতায় পৌছলাম দিল্লি হয়ে। দু'দিন কলকাতায় কেনাকাটা ও বেড়ানোর পর স্বদেশের পথে বেনাপোল সীমান্তে যখন পৌছলাম তখন দুপুর।

হাবিবুর রহমান স্বপন সাংবাদিক, লেখক

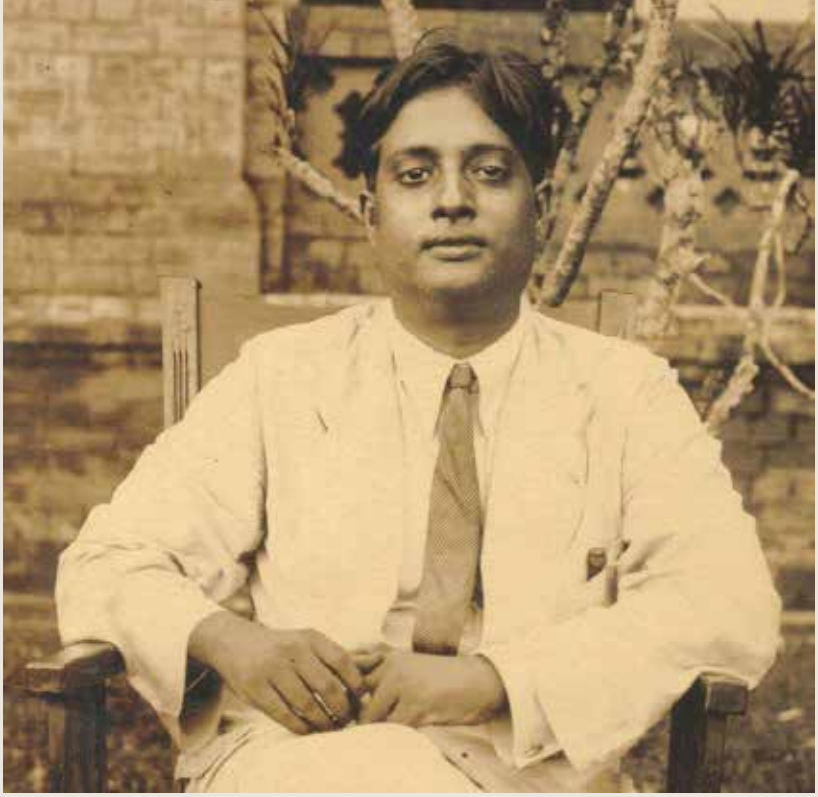

স্মরণ

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম কলকাতায় ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল গাণিতিক পদার্থবিদ্যা। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয়। ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন বৃহত্তর বাংলার তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলকাতা, ঢাকা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। সান্নিধ্য পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাদাম কুরী প্রমুখ মনীষীর। আবার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগও রাখতেন দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রবল সমর্থকই ছিলেন না, সারাজীবন ধরে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাটিকেও পুষ্ট করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর অমর উক্তি, 'যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।' বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিচয় নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নিরলস, কর্মঠ ও মানবদরদী মনীষী। বিজ্ঞানের পাশাপাশি সংগীত ও সাহিত্যেও ছিল তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও বিশেষ প্রীতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের বিশ্বপরিচয় বিজ্ঞান গ্রন্থ, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর জাপানে ভ্রমণ রচনা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অর্কেস্ট্রা কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন।

উত্তর কলকাতার গোয়া বাগান অঞ্চলে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পাশে ২২ নম্বর ঈশ্বর মিত্র লেনে সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ২৪ পরগণার কাঁড়োপাড়ার নিকটবর্তী বড়ো জাগুলিয়া গ্রামে। তাঁর বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ের হিসাব রক্ষক এবং মা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় নর্মাল স্কুলে। পরে বাড়ির সন্নিকটে নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হন। এরপর তিনি হিন্দু স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাশে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। তারপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১১ সালে আই এস সি পাশ করেন প্রথম হয়ে। এই কলেজে তিনি সান্নিধ্যে আসেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতন যশস্বী অধ্যাপকদের। ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে একই ফলাফলে মিশ্র গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯১৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সঙ্গে মিশ্র গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসাবে যোগ দেন।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন বসু প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তেজস্ক্রিয়তা নীতি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই প্রতিপাদন করে একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সদৃশ কণার সাহায্যে দশার সংখ্যা গণনার একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেন। নিবন্ধটি ছিল মৌলিক এবং কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ভিত্তি রচনাকারী। প্রবন্ধটি প্রকাশ করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বসু তা সরাসরি আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দেন, যিনি প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজেই তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বসুর পক্ষে তা Zeitschrift für Physik সাময়িকীতে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বসু ভারতের বাইরে গবেষণার সুযোগ লাভ করেন এবং দু'বছর ইউরোপে অবস্থান করে লুই ডি ব্রগলি, মেরি কুরি, এবং আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন।

১৯২৭ সালে ইউরোপ সফর শেষে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। বসু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন এবং দেশবিভাগ আসন্ন হলে তিনি কলকাতায় ফিরে যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করে। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি বিশ্বভারতীতে উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করেন ১৯৫৯ সালে।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এছাড়া তিনি শ্রেণীকক্ষে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াতেন। ক্লাসে একদিন আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ও অতিবেগুনি বিপর্যয় পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান তত্ত্বের দুর্বলতা বোঝাতে এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ব্যত্যয় তুলে ধরেন। সে সময় তিনি ঐ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে একটি ভুল করেন। পরে দেখা যায় তার ঐ ভুলের ফলে পরীক্ষার সঙ্গে তত্ত্বের অনুমান মিলে যাচ্ছে! (বসু পরে তার ঐদিনের লেকচারটি একটি ছোট নিবন্ধ আকারে Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta নামে প্রকাশ করেন।)

তার এই ভুলটিকে পরিসংখ্যানের একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে। দুইটি ভাল মুদ্রাকে যদি নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ বার দুই হেড পড়বে– এমন অনুমান স্বভাবতই ভুল। ঠিক এমন একটি ভুল তিনি করেছিলেন। কিন্তু ফলাফলটা এমন হল যে তা মিল খেয়ে গেল পরীক্ষার সঙ্গে। তাতে তিনি ভাবলেন– এই ভুল ভুল নয়। প্রথমবারের মত তার মনে হল ম্যাক্সওয়েল বোলৎজম্যানের সংখ্যাতত্ত্ব আণুবীক্ষণিক কণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ সেখানে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব-র কারণে কণার যে আন্দোলন তা গ্রাহ্য সীমার মধ্যে। কাজেই তিনি কণার ভরবেগ ও অবস্থানের ব্যাপারটি বাদ দিয়ে দশা-কালে কণার প্রাপ্যতা নির্দেশ করলেন। এটি দাঁড়ায় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের ঘনমান (h^3)।

পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্বখ্যাত জার্নাল Physics journals বসুর ঐ প্রবন্ধ প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়। তারা ধরে নেয় যে, ঐ ভুল, ভুলই; নতুন কোন কিছু নয়। হতাশ হয়ে বসু বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে তা লিখে পাঠান। আইনস্টাইন ব্যাপারটা বুঝতে পারেন এবং নিজেই একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলেন এবং বসুর নিবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর তার ও বসুর নিবন্ধ দুইটি জার্মানির Zeitschrift für Physik সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি ঘটে ১৯২৪ সালে।

বসুর 'ভুল' সঠিক ফলাফল দেওয়ার কারণ হল একটি ফোটনকে আর একটি ফোটন থেকে আলাদা করা মুশকিল। তাই দুইটি ফোটনের একদম একই শক্তি ভাবাটা ঠিক নয়। কাজেই দুইটি মুদ্রার একটি ফোটন আরেকটি বোসন হয় তবে দুইটি হেড হওয়ার সম্ভাবনা তিনের-এক হবে। বসুর ভুল এখন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত।

আইনস্টাইন এই ধারণাটি গ্রহণ করে তা প্রয়োগ করলেন পরমাণুতে। এই থেকে পাওয়া গেল নতুন প্রপঞ্চ যা এখন বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট নামে পরিচিত। এটি আসলে বোসন কণার একটি ঘনীভূত স্যুপ। ১৯৯৫ সালে এক পরীক্ষায় এটির প্রমাণ পাওয়া যায়। আর বিশ্বজগতের যে কণাগুলোর স্পিন পূর্ণসংখ্যা বসুর নামে পল ডিরাক তার নামকরণ করেন বোসন কণা।

বোস ও নোবেল পুরস্কার

বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান, বসু-আইনস্টাইন ঘনীভবন, বোসনের উপর গবেষণা করে ১৯৮৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন Carlo Rubbia এবং Simon van der Meer, ১৯৯৬ সালে David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson, ১৯৯৯ সালে Martinus J. G. Veltman ও Gerardus 't Hooft, ২০০১ সালে Eric Allin Cornell, Carl Edwin Wieman এবং Wolfgang Ketterle, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বোসকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়নি। তাদের নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of the condensates.

ড. জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর তাঁর সম্পর্কে বলেন,

"S. N. Bose's work on particle statistics (c. 1922), which clarified the behaviour of photons (the particles of light in an enclosure) and opened the door to new ideas on statistics of Microsystems that obey the rules of quantum theory, was one of the top ten achievements of 20th century Indian science and could be considered in the Nobel Prize class."

সত্যেন বসু ১৯২৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং ১৯৪৪সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো হন। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনীত করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম এবং ভারত সরকার পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে সত্যেন বসু অধ্যাপক (Bose Professor) পদ রয়েছে। ১৯৮৬ সালে কলকাতা শহরে তাঁর নামে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র নামে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তার অমূল্য অবদান রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের মুখপাত্র হিসেবে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ সালে *জ্ঞান ও বিজ্ঞান*-এ কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে 'রাজশেখর বসু সংখ্যা' প্রকাশ করে তিনি দেখান, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক নিবন্ধ রচনা সম্ভব। ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এই ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। ● সংকলিত

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৮-১৯

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন সম্প্রতি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স (আইসিসিআর) শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা করেছে। একমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া অন্য সব বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে পড়াশোনা করার জন্য মেধাবী বাংলাদেশী নাগরিকদের এই শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে। ভারত সরকার এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ বাংলাদেশী নাগরিককে আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছে।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি পর্যায়ে (চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া) বিভিন্ন কোর্সে পড়াশোনা করার জন্য নিম্নলিখিত বৃত্তি স্কিমগুলো দেওয়া হয়েছে–

১. বাংলাদেশ বৃত্তি স্কিম (প্রকৌশলসহ স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের জন্য);
২. ভারত বৃত্তি স্কিম (প্রকৌশল ছাড়া স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সের জন্য);

বৃত্তি পেতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং পাশকৃত পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর অথবা জিপিএ ৫-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করার জন্য https://a2ascholarships.iccr.gov.in এই ঠিকানায় নিজেদের ব্যক্তিগত লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিতে হবে। আবেদনকারীদের নির্দেশনাগুলো পড়ে অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদনের সময় আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

ক. যারা BE/B Tech. কোর্সের জন্য আবেদন করবেন তাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
খ. আবেদনকারীর বয়স অবশ্যই জুলাই ২০১৮ এর মধ্যে ১৮ হতে হবে।
গ. সব শিক্ষার্থীকে হোস্টেলে থাকতে হবে। পরিবার ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কারণ ছাড়া বাইরে অবস্থান করা যাবে না।

অনলাইনে আবেদন জমা দেয়ার শেষ সময় ছিল ২০ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল ৫.০০টা। প্রার্থীদের ৩০ মিনিটের ইংরেজিতে দক্ষতা যাচাইয়ে অংশ নিতে হবে যার সময় ও স্থান জানিয়ে দেওয়া হয়।

বিস্তরিত তথ্যের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়:
শিক্ষা শাখা, ভারতীয় হাই কমিশন
১-৩ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা
ফোন: ৫৫০৬৭৩০-৫৫০৬৭৩০৮
এক্সটেনশন- ১০৯৬/১১১২।
ই-মেইল: edu1.dhaka@mea.gov.in

• বিজ্ঞপ্তি

ছোটগল্প

দেবা

নারায়ণ সাহা

পলেস্তারা উঠে যাওয়া এক চিলতে দাওয়ায় বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিল কল্যাণী। নাঃ... এভাবে চলতে পারে না, আজ চারদিন হল একটাও খদ্দেরের দেখা নেই... চোখের সামনে দিয়ে মিনসেগুলো সুমিতা প্রতিমা পার্বতীদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে... এদিকে একবার মুখ তুলেও দেখছে না। কি আশ্চর্য! এমনতো কোনদিন হয় না... ছ'মাস হল এ পাড়ায় এসেছে... এমন শুখা অবস্থায় মুখ কোনদিন দেখতে হয়নি। বরং কতদিন বিরক্ত হয়ে নিজে থেকে খদ্দেরকে ভাগিয়ে দিয়েছে কল্যাণী। না ভাগিয়ে অবশ্য উপায়ও ছিল না, হাজার হোক মানুষের শরীর তো রে বাবা.. লোহা-লক্কড়ের মেসিন তো নয়! তাই-বা বলি কি করে অতি ব্যবহারে লোহার মেসিনও এক সময় জবাব দেয়... আর এতো রক্ত-মাংসের গতর!

খদ্দের লক্ষ্মী, সেই খদ্দেরকে ভাগিয়ে দেবার জন্যই বুঝি আজ লক্ষ্মী বিমুখ হয়েছে। কি জানি কেউ আবার লাগানি-ভাঙানি করেনি তো? এ সব মাগীদের বিশ্বাস নেই... ওরা সব পারে, মন-গড়া কিছু একটা রটিয়ে দিলেই হল। মন্দা চলছিল দিনদশেক আগে থেকেই... তবু টুকটাক দু'একজন আসছিল ঠিকই। কিন্তু আজ চারদিন হল বউনি পর্যন্ত হয়নি।

রোজকার রোজগারে দিন চলা, সঞ্চয় বলে তো কিছু নেই, তার ওপর বাড়িওয়ালির পাঁচদিনের ঘরভাড়া বাকি পড়েছে। বাড়িওয়ালি পুষ্পমাসি কাউকে রেয়াত করে কথা বলে না, কালই সাফ করে জানিয়ে দিয়েছে– এসব ছেঁদো কথা আমাকে শুনিও না বাছা, কল্যাণীর ঘরে খদ্দের আসে না... এ সব বাহানা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? গতরের সব চুল ওমনি সাদা হয়নি। অন্য কোন মতলব থাকলে সাফ সাফ জানিয়ে দাও। কালকের মধ্যে বাকি ভাড়া মিটিয়ে না দিলে ঘরে তালা মেরে দেব। আমি বাপু ধারে কারবার করি না। আমার কাছে সোজা কথা, ফেলো কড়ি মাখো তেল।

এই ক'মাসে পুষ্পমাসিকে বেশ ভালই চিনেছে কল্যাণী। বুড়ি মুখে যা বলে কাজেও তাই করে। আর সেই জন্যই গোটাচারেক পোষা গুণ্ডা হাতে আছে, ওদের জন্য সবকিছু ফ্রি, মহল্লার সবাই ভয় করে চলে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে কি করে যে কি হবে ভেবে পায় না কল্যাণী। সব রাগ গিয়ে পড়ে সুকুমারের ওপর, ভাবে ওই হারামিটার জন্যই তো আজ আমার এই অবস্থা... নইলে এমনটাতো হবার কথা ছিল না।

স্বচ্ছল পরিবার না হলেও নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরেরই মেয়ে ছিল আজকের কল্যাণী। একটা সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করছিল। আর এক বছর পরে মাধ্যমিক দেবে। বাবা শিবনাথের ইচ্ছে পাশটা করলেই কোথাও একটা ট্রেনিং-এ লাগিয়ে দেবে। অভাবের সংসারে যা হয়। আর তখনই এসে জুটল পাশের পাড়ার সুকুমার। দেখতে শুনতে একেবারে মাকাল ফল। ব্যস পড়াশোনা শিকেয় উঠল। পরীক্ষাটা দিয়েছিল বটে কিন্তু একমাত্র ইতিহাস বাদে সব বিষয়েই ফেল। পড়াশোনার ওখানেই ইতি হয়ে গেল। কিন্তু সুকুমারের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি থেমে থাকল না। মা তো আর নেই। বাবা-দাদারা আর কত সামলাবে? বৌদির সঙ্গে তো খিটিমিটি লেগেই থাকত। এভাবেই দেখতে দেখতে তিনটে বছর পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কল্যাণী জেনেছে সুকুমারের দু-খানা ট্যাক্সি আছে, একখানা ভাড়া খাটে আর একখানা নিজেই চালায়। আরো একখানা কেনা হয়েছে, রোড পারমিট পেলেই রাস্তায় নামবে। কল্যাণীর মনটা তখন নীল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুকুমারের পীড়াপীড়িতেই বৌদির মারফৎ বিয়ের প্রস্তাবটা শিবনাথের কানে তুলেছিল। শিবনাথের কানে কথাটা যেতেই শিবনাথ সরাসরি প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছিল– ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না। কী আর এমন বয়স হয়েছে... কিছুদিন যাক, আমরাই দেখেশুনে ভাল ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

কল্যাণী তখন সুকুমারের সঙ্গে মজেছে, এ-সব কথা শুনবে কেন? ফলে যা হয়, কথায় কথায় ঝগড়া-অশান্তি নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ওদিকে সুকুমারের রঙিন হাতছানিতো আছেই। শেষ পর্যন্ত কাউকে কিছু না জানিয়ে সুকুমারের সঙ্গেই ঘর ছেড়েছিল কল্যাণী। শিবনাথ কিন্তু মা-মরা মেয়েটার জন্য সেদিন অনেক কেঁদেছিল।

পাশের পাড়াতে নয়, সুকুমার সেদিন কল্যাণীকে নিয়ে বেহালায় একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিল। কিছুদিন বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু এই ভাল বেশদিন স্থায়ী হল না... প্রথম প্রথম সুকুমার প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরত না, যখন ফিরত তখন নেশায় পা টলছে। 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কল্যাণী জেনে গেল সুকুমারের তিনখানা ট্যাক্সি নেহাৎই গল্পকথা। আসলে সুকুমার অটো চালায়, তাও নিজের নয়। এখান থেকেই অশান্তির শুরু। এমন কি গায়ে হাত তুলতেও সুকুমার পিছপা হল না। এদিকে কয়েকমাসের বাড়িভাড়াও বাকি পড়েছে।

সুতরাং আবার স্থান পরিবর্তন করার দরকার হল। এবার কল্যাণীকে নিয়ে তুলল মোমিনপুরের এক নিষিদ্ধপল্লীতে। কি উদ্দেশ্যে কল্যাণীকে এখানে নিয়ে এসেছে সে কথা বুঝতে কল্যাণীর কোন অসুবিধা হল না। সুকুমার যে এতটা নিচে নামতে পারে সে কথা কল্যাণী স্বপ্নেও ভাবেনি। সবকিছু দেখেশুনে কল্যাণীর মনে হল এ পাড়ায় সুকুমার নতুন নয়, অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে। সুতরাং এখান থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, এভাবেই কল্যাণী নরকের পাঁকে তলিয়ে গেল।

এখানেই কিন্তু থেমে থাকল না, কল্যাণীর সবচেয়ে খারাপ লাগত যখন প্রচণ্ড মারধোর করে গতর বেচে কামাই করা সব পয়সা সুকুমার জোর করে কেড়ে নিত। এক সময় এও জানতে পারল যে, কলকাতার বিভিন্ন নিষিদ্ধপল্লীতে সুকুমারের শতাধিক তথাকথিত বউ আছে, যাদের উপার্জনের টাকায় সুকুমারের এত লপচপানি। অটো চালানোটাও একটা

এক মিনিটের জন্য ঘরে ঢুকে চোখের কাজল, ঠোঁটের রং ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে পায়ে পায়ে বড় গলির দিকে এগিয়ে গেল। বাঁকের মুখে এসে ভাবল এখানেই দাঁড়ানো যাক, এখান থেকে তিনদিকেই নজর রাখা যাবে। গলির বাঁকের মুখে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কল্যাণী।

লোক দেখানো বাহানামাত্র।

সবকিছু দেখেশুনে কল্যাণী বারকয়েক চেষ্টা করেছিল এখান থেকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি, মাঝখান থেকে ধরা পড়ে গিয়ে কপালে জুটেছিল বেদম মার। এরপরেও কল্যাণী কিন্তু থেমে থাকেনি। কপিলা নামের একটা নেপালী মেয়ের সাহায্যে ওই নরক থেকে পালাবার ব্যবস্থা পাকা করেছিল। কপিলাই কালীঘাটের এই বস্তির সন্ধান দিয়ে বলেছিল– 'ওখানে গেলে সুকুমার তোর টিকিও ছুঁতে পারবে না, কারণ সুকুমার ভাল করেই জানে ওখানে গেলে ওকে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হবে না।

কল্যাণী কিন্তু মোমিনপুর বস্তি থেকে বেরিয়ে কালীঘাটে না গিয়ে সোজা নিজেদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। দু'বছর পর নিজের মেয়েকে দেখে শিবনাথ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে যথেষ্ট রুক্ষভাবেই বলেছিল– কী চাই? কেন এসেছ এখানে? দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

অনেক কান্নাকাটি অনেক চোখের জলেও শিবনাথের মন গলেনি। শিবনাথের এক কথা, আজ থেকে দু'বছর আগে আমার মেয়ে মরে গেছে।

দাদাদেরও এক কথা– তোকে বাড়িতে জায়গা দিলে পাড়ায় আমরা মুখ দেখাতে পারব না। তুই কি করিস, কোথায় থাকিস, সুকুমার সে-সব কথা পাড়ায় ফলাও করে সবার কাছে বলে গেছে। এরপরেও বাড়িতে তোকে জায়গা দেবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না। ঘাড় ধাক্কা দেবার আগে নিজে থেকেই বিদেয় হয়ে যা।

কল্যাণী বুঝে গিয়েছিল পৃথিবীতে ওর একটা নতুন পরিচিতি হয়ে গেছে। হাজার চাইলেইও আর ফিরে আসার উপায় নেই। আপনজনের চেনা দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। তাই গুটিগুটি কালীঘাটে পুষ্পমাসির ছাতার তলায় ফিরে এসেছিল। তাও প্রায় ছ'মাস হতে চলল... খেয়ে পরে এরকম চলছিল, কিন্তু এমন দুঃসময় কখনো আসেনি।

এতক্ষণ কল্যাণী যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। হঠাৎ করে পুষ্পমাসির হুঁশিয়ারির কথা মনে পড়তেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল– নাহ্, এভাবে ঘরের দাওয়ায় বসে থাকলে চলবে না। বাড়ি বয়ে কেউতো আর পয়সা দিয়ে যাবে না। কাল পুষ্পমাসিকে যদি অন্তত দু'দিনের ভাড়াটাও মিটিয়ে দেওয়া যায়!

এখানে এই কানাগলিতে বসে কিছু হবে না। নতুন খদ্দের নিজে থেকে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। বড় গলিটাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

এক মিনিটের জন্য ঘরে ঢুকে চোখের কাজল, ঠোঁটের রং ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে পায়ে পায়ে বড় গলির দিকে এগিয়ে গেল। বাঁকের মুখে এসে ভাবল এখানেই দাঁড়ানো যাক, এখান থেকে তিনদিকেই নজর রাখা যাবে। গলির বাঁকের মুখে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কল্যাণী।

ল্যাম্পপোস্ট একটা আছে ঠিকই কিন্তু আলো এত কম যে পথ চলতি মানুষটাকে দেখা যায় ঠিকই কিন্তু তার মুখটা স্পষ্ট বোঝা যায় না। মনে হয় ইচ্ছে করেই এখানে কম পাওয়ারে বাল্ব লাগানো হয়েছে।

এ পাড়ায় আসার পর থেকে কল্যাণীকে খদ্দের ধরতে এভাবে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়নি... শালা একেই বলে পেটের জ্বালা। দু'চারজন বড় গলি ছেড়ে ছোট গলিতে ঢুকল ঠিকই তবে এরা সব মোহনী, তুলসী ফতিমাদের বাঁধা বাবু। এখানে নাক-গলানো যাবে না। কল্যাণী এ পাড়ায় নতুন তাই এখনো বাঁধাবাবু হয়নি। উড়ন্ত খদ্দেরই ভরসা। কিন্তু হলটা কি আধঘণ্টার বেশি হয়ে গেল একটা মাকড়সারও দেখা নেই! তবে কি সব

মাঝে মধ্যে এই সব বুড়োগুলোও এ পাড়ায় আসে। বয়সকালের স্বভাব যাবে কোথায়? ক্ষমতা না থাক হ্যাঁচড়-পোচড় করে মরে, অস্থানে কু-স্থানে হাত বুলিয়ে ঠোঁট বুলিয়ে মনের খোয়াইশ মেটায়। তবে হ্যাঁ, এরা কিন্তু দেবার বেলায় কিপটেমি করে না, বরং রেটের চেয়ে কিছু বেশিই দেয়।

শালা মাকড়াগুলো ভদ্রলোক বনে গেল! গলিতে নেমে এসে দেওয়াল ধরে দাঁড়াল অথচ পেটও ভরল না, কপালটাই খারাপ!

কিছুটা হতাশ হয়েই কল্যাণী ভাবল– হবে না, আজো কিছু হবে না... তার চেয়ে বরং ঘরেই ফিরে যাই। নিশ্চয়ই কারো কু-নজর লেগেছে, নইলে এমনটা হবে কেন? এইতো কিছুদিন আগেও হারামিগুলো ভাদ্রমাসের কুকুরের মত গায়ে গায়ে লেপটে থাকত, এখন সব শালার পাখা গজিয়েছে। তার চেয়ে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভাল। আবার ভাবল ঘরে গিয়েই বা কোন কলা ছাড়াবে, তার চেয়ে আরো একটু না হয় দেখাই যাক, বেড়ালের ভাগ্যে যদি শিঁকে ছেড়ে।

দুটো ধোপ-দুরস্ত মাল সামনে দিয়ে চলে গেল। ইশারা সত্ত্বেও একবার ফিরেও তাকাল না, কি লজ্জা! এ কথা কারো কাছে বলা যাবে না। তবে কি এ পাড়া থেকে অন্ন ঘুচল? কি হবে এরপর? লোকের বাড়িতে কি ঝি-গিরি করতে হবে? বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কল্যাণীর।

হঠাৎই কল্যাণীর নজর পড়ল বড় রাস্তার দিক কেউ একজন এইদিকেই এগিয়ে আসছে। পুরুষ না মহিলা আবছা আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এতো আস্তে হাঁটছে কেন! মনে হয় এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজছে! আরো একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল পুরুষ মানুষই বটে। কিন্তু এ কি, এ যে দেখছি ধুতি-পরা মাল! নিশ্চয়ই কোন দেহাতি হবে। নয়তো ওই রকম ক্যাবলার মত কেউ হাঁটে? আরো একটু এগিয়ে আসতে কল্যাণী হতাশ হল– যাঃ কলা, এ যে দেখছি বুড়ো হাব্ড়া! এই ঘাটের-মরা এখানে কি করতে এসেছে, যতসব ন্যাকমি, ঢং দেখে আর বাঁচি না। তবে আজ বুড়ো হাব্ড়াই কপালে আছে?

মাঝে মধ্যে এই সব বুড়োগুলোও এ পাড়ায় আসে। বয়সকালের স্বভাব যাবে কোথায়? ক্ষমতা না থাক হ্যাঁচড়-পোচড় করে মরে, অস্থানে কু-স্থানে হাত বুলিয়ে ঠোঁট বুলিয়ে মনের খোয়াইশ মেটায়। তবে হ্যাঁ, এরা কিন্তু দেবার বেলায় কিপটেমি করে না, বরং রেটের চেয়ে কিছু বেশিই দেয়।

কল্যাণী ঠিক করে নিল, হোক বুড়ো ক্ষতি কি? আমার তো পয়সা পাওয়া নিয়ে কথা। পুষ্পমাসির কথায়– ফেলো কড়ি মাখো তেল, আমি কি তোমার পর?

বুড়োটা তখনো হাতদশেক দূরে, কল্যাণী পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একেবারে বুড়োর মুখোমুখি দাঁড়াল– কী গো নাগর, এমন উতলা হয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? খাবার থালাতো তোমার সামনে হাজির, চল আমার ঘরে চল, উল্টে পাল্টে যেমন খুশি খাবে।

ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটু দূরে হওয়াতে এখানে অন্ধকারটা কিছু বেশি। বুড়ো লোকটা কল্যাণীর মুখের কাছে মুখ এনে কি যেন খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, যেন চোখের পলক পড়ছে না...

কল্যাণী মুচকি হেসে বলল– অমন হা করে কি দেখছ নাগর, গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে কিনা? নাগো না, পঞ্চাশ বছরের বুড়ি নই, একেবারে ডাঁশা মাল, হাত দিয়ে পরখ করতে পার।

বুড়ো লোকটা কিন্তু একইভাবে তাকিয়ে আছে, অন্ধকারে মুখটা ঠাহর করতে পারছে না ঠিকই... কি বলছে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও কিন্তু গলার স্বরটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্রবল উত্তেজনায় বুড়ো লোকটা যেন কথা বলতেই ভুলে গেছে। পাছে খদ্দের হাতছাড়া হয়ে যায় সেই আশংকায় কল্যাণীর যেন তর সইছে না, তাই বলল– এই অন্ধকারে গলিতে অমন হ্যাংলার মত কি দেখছ নাগর ঘরে চল পাহাড় পর্বত নদীনালা সব দেখাব... তখন প্রাণভরে দেখো। পকেটে রেস্তো আছে তো?

বুড়ো লোকটা এবার প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল এই সেই মেয়ে। আর তখনই কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল– তুই দেবারতি না।

নামটা শোনামাত্র কল্যাণীর পায়ের সামনে যেন বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটল, কেঁপে উঠল কল্যাণী। এ কার গলা শুনছে! আবছা আলোয় এতক্ষণ মুখটা দেখতে পায়নি কিন্তু গলার স্বর শোনার পর আর কোন সন্দেহ রইল না। কল্যাণী যেন আর্তনাদ করে উঠল– না-না, আমি দেবারতি নই, আমি কল্যাণী, আমি কল্যাণী... বলতে বলতে ঘুরে পালাবার চেষ্টা করতেই ভদ্রলোক খপ্ করে কল্যাণীর একটা হাত ধরে ফেলল– এই বুড়োটাকে ফেলে কোথায় পালাচ্ছিস মা? একবার যখন তোর দেখা পেয়েছি তখন আর তোকে ছেড়ে দিতে পারব না।

কল্যাণী যেন আর্তনাদ করে উঠল– বিশ্বাস করো আমি আমি দেবারতি নই, আমি কল্যাণী। দেবারতি বলে আমি কাউকে চিনি না।

সে তুই যতই বলিস মা, আমি বুড়ো হতে পারি কিন্তু আমার চোখ আর কানকে তুই ফাঁকি দিতে পারবি না 'দেবা'।

দু-অক্ষরের এই ছোট্ট 'দেবা' শব্দটার মধ্যে কি যাদু ছিল কে জানে, কতদিন পরে এই 'দেবা' ডাকটা শুনে কল্যাণী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। একমাত্র জেঠুই দেবারতিকে আদর করে দেবা বলে ডাকত। আর দেবারও যত আবদার যত বায়না সব জেঠুর কাছে। আজও এই দেবা ডাকটাই সবকিছু ওলট-পালট করে দিল। ডুকরে কেঁদে উঠে কল্যাণী বলল– তুমি কেন এই নোংরা গলিতে পা রাখতে গেলে জেঠু, তোমার মত মানী লোকের এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।

না এসে কি উপায় আছে রে মা! আমার মা যে এখানে আছে, তাকে নিয়ে যাবার জন্যই তো এখানে আসা।

কিন্তু জেঠু আমার তো তোমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। আমি আর আগের দেবা মা নেই, আমি খারাপ হয়ে গেছি, খুব খারাপ। চোখ মুছল কল্যাণী।

নারে মা, মানুষ কখনো খারাপ হয় না, কিছু দুষ্ট লোক নিজেদের স্বার্থে অন্যকে খারাপ করার চেষ্টা করে।

কল্যাণী কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। পাশ দিয়ে ওর পাশের ঘরের পারুল একটা মাঝবয়েসি লোককে দৃষ্টিকটুভাবে জড়িয়ে ধরে কল্যাণীকে কিছু একটা ইশারা করে ছোট গলিটায় ঢুকে গেল।

লজ্জায় মুখটা নিচু করে কল্যাণী বলল– এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে না জেঠু, তুমি বরং ফিরে যাও।

ঠিকই বলেছিস মা, এখানে নয়, আমরা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাই, গলির দম বন্ধ-করা অন্ধকারটা আমি ঠিক সহ্য করতে পারছি না।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিয়েই বাঁদিকে বাঁক নিতে যাচ্ছিল তখনই কল্যাণী বলল– বাজারের দিকে নয় জেঠু, তার চেয়ে বরং ডানদিকে চল, ট্রাম-রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে।

তাই চল মা, তবে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নয়, বাড়িতে গিয়েই আমরা কথা বলব। বাড়ি থাকতে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা হবে কেন?

বাড়ি! আমার তো কোন বাড়ি নেই। জানো জেঠু, কিছুদিন আগে আমি একটু আশ্রয়ের আশায় বাড়ি গিয়েছিলাম, কিন্তু বাবা এবং দাদারা...

কল্যাণীকে এখানেই থামিয়ে দিয়ে জেঠু বলল– ও সব কথা থাক মা, আমি সব জানি... সব খবর জেনেই এখানে এসেছি।

আমি যে এখানে আছি, সেকথা তুমি জানলে কি করে জেঠু?

মাসদুয়েক আগে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোর কথা জিজ্ঞেস করতেই বলল– তুই এখানে আছিস। আরো অনেক কথা বলল, সে সব শুনে তোর কাজ নেই। তারপর থেকে অনেকদিন এখানে এসে তোর খোঁজ করেছি, কিন্তু সবার মুখেই এক কথা, দেবারতি বলে কাউকে চিনি না।

চিনবে কি করে, যাতে কেউ আমাকে খুঁজে না পায় সেই জন্য আমি নিজেই নামটা বদলে নিয়েছি, এখন আমি কল্যাণী। দেবারতি মরে গেছে।

এমনটা কখনই হতে পারে না, আমার দেবা কখনো হারিয়ে যেতে পারে না, বরং আজ থেকে কল্যাণীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, আমার দেবাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

তা না হয় জেঠু, আমার মত একটা খারাপ মেয়েকে আশ্রয় দিলে

লোকে তোমার দিকে আঙুল তুলবে, তোমার অসম্মান হবে।

তুই তো জানিস আমি কারো আঙ্গুল তোলার পরোয়া করি না, তাছাড়া তুই আশ্রয়ের কথা বলছিস কেন মা, ওটা তো তোরই বাড়ি। আমার আর কে আছে বল, আমিই-বা আর ক'দিন? আমার যা কিছু আছে, সব তো তোরই। তোকে সঙ্গে না নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব না। ওই পচা গলিতে তোকে কিছুতেই যেতে দেব না।

চলতে চলতে দেবারতি হঠাৎ করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। জেঠু ব্যস্ত হয়ে বলল– কি হল দাঁড়িয়ে গেলি কেন, দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই, এখন থেকে তোর এগিয়ে চলার শুরু।

দেবারতির মুখে কোন কথা নেই, চুপ করে কিছু একটা ভেবে চলেছে। একটা প্রায় খালি ট্রাম টিংটিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে কালীঘাট ব্রিজের দিকে চলে গেল। জেঠু আবার বলল– কি ভাবছিস দেবা।

ভাবছি আমার বোকামির কথা। আগে যে কেন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি? কিন্তু জেঠু আমাকে যে একবার ওই পচা গলিতে যেতে হবে। আমার কয়েকটা জিনিস, কিছু কাপড়-জামা সবতো ওখানেই আছে।

থাক্ ওসব ওখানেই থাক্। আনতে হবে না। কালই দোকানে গিয়ে তোর পছন্দমত কাপড়-জামা সব কিনে নিয়ে আসব। এখন চলত মা, হাজরা পার্কের সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাই, এখানে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

তাই চল, আমারও এখানে ভাল লাগছে না। দু'জনেই ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলল। দমকল অফিসের সামনে এসেই জেঠু বলল– এক কাজ করলে কেমন হয়, তুই তো জানিস, আমি নিজেই রান্না করে খাই। আজ তো রান্নাবান্না কিছু করা হয়নি। এই রাতে বাড়ি গিয়ে আবার রান্না করা ঠিক পোষাবে না, তার চেয়ে দোকান থেকে দু'জনের মত খাবার কিনে নিয়ে গেলে কেমন হয়। কাল থেকে না হয় বাপবেটির সংসার নতুন করে শুরু হবে।

খুব ভাল হয় জেঠু, তুমি বরং তাই কর।

তাহলে এক কাজ কর, তুই এখানে দাঁড়া, এই বাঁদিকের রাস্তাটায় একটু ঢুকে এগিয়ে গেলেই রানি শংকরী লেনের মুখেই একটা ভাল রেস্টুরেন্ট আছে, আমি ওখান থেকে দু'জনের মত লুচি আর কষা মাংস নিয়ে আসি। বেশি দেরি হবে না, দশ মিনিটেই ফিরে আসব।

আমি বুঝি এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব? তা হবে না। লোকে কি ভাববে?... না বাবা, এই সাজে আমি দোকানেও যাব না। আমি বরং সামনের বাসস্টপে দাঁড়াই লোকে ভাববে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তুমি কিন্তু দেরি কোরো না জেঠু।

দেরি কেন করব, খাবারটা প্যাক্ করে দিতে যেটুক সময় লাগে।

জেঠু বাঁদিকে হরিশ মুখার্জি রোডে ঢুকে গেল। দেবারতিও পায়ে পায়ে বাস স্টপেজের দিকে এগিয়ে গেল। সুন্দর ঝক্‌ঝকে সেড তৈরি হয়েছে, এমনটাতো আগে ছিল না। সত্যি অনেক কিছুই বদলে গেছে। দেবারতিও কি বদলায়নি! এই দেবারতি নামটা, এটাও তো জেঠুরই দেওয়া। কি ভালই না বাসত। জেঠু চিরকালই খুব নরম মনের মানুষ। তখন কত আর বয়স হবে ছয় কি সাত, ঠিক মনে পড়ছে না।.... জেঠিমণি হঠাৎ কি একটা অসুখে মারা গেল। জেঠু কিন্তু অনায়াসে আবার বিয়ে করে সংসারী হতে পারত, কিন্তু করেনি। বাবাটা যেন কেমন, জেঠুকে কখনই ভাল চোখে দেখত না। আসলে বাবা মনে হয় জেঠুকে হিংসে করত। জেঠু খুব ভাল গান গাইতে পারত। পাড়ার লোকেরাও জেঠুকে খুব ভালবাসত। দেখতে দেখতে কেমন সবকিছু বদলে গেল। আমি ঘর ছাড়ার আগে যদি জেঠুর সঙ্গে দেখা করতাম....

কিন্তু এতক্ষণ হয়ে গেল... জেঠু আসছে না কেন? দশমিনিট অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে গেছে... মনে হয় আধঘণ্টা হতে চলল। অধৈর্য হয়ে পড়ে দেবারতি। আরো প্রায় আধঘণ্টা ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার পর দেবারতি ভাবল– তবে কি জেঠু পালিয়ে গেল! আবেগের বশে তখন হয়তো আমাকে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছিল। পরে দেখল এই উটকো ঝামেলা ঘাড়ে নেবার কোন মানে হয় না, তাই খাবার কেনার বাহানায় পালিয়ে বেঁচেছে। যাক কি আর করা আমারই কপাল খারাপ, বুড়োটাকে বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। বুড়োটা নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গলিতে ঢুকেছিল। আর বসে থাকার কোন মানে হয় না, তাই উঠে পড়ল দেবারতি। ভাবল একবার

দেবারতি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাম-রাস্তার দিকে চলতে শুরু করল। মোড়ের মাথায় এসে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল– এবার কোন্ দিকে যাওয়া যায়। না, দেবারতির আর কোন দিক জানা নেই, একটাই পথ জানা ডানদিকে পুষ্পমাসির আস্তানা, কিন্তু সেখানে কি ঠাঁই মিলবে?

দেখাই যাক না রানি শংকরী লেনের মুখে রেস্টুরেন্টটায় গিয়ে।

দূর থেকেই নজরে পড়ল রেস্টুরেন্টের সামনে একটা পুলিশের গাড়িকে ঘিরে বেশ কিছু মানুষের জটলা। পা চালিয়ে জটলার সামনে যেতেই দেখল ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা লোককে দু'জন লোক মিলে চ্যাংদোলা করে পুলিশের গাড়িতে তুলে দিচ্ছে। মনে হয় লোকটা বেঁচে নেই। দেবারতির বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল... ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক লোক...! জেঠু নয়তো?

কাকে জিজ্ঞেস করে... কি করে ভেবে পায় না দেবারতি।

পুলিশের গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট দিয়েছে। দেবারতি রেস্টুরেন্টের ক্যাশ কাউন্টারে বসা লোকটাকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল– এখানে কি হয়েছে?

লোকটা আক্ষেপ করে বলল– আর বলবেন না ম্যাডাম, একেই বলে নিয়তি... কিছুক্ষণ আগেই ভদ্রলোক এসে বলল, দশখানা কচুরি আর দু'প্লেট কষা মাংস প্যাক করে দিতে। ভদ্রলোককে এর আগেও মনে হয় দেখেছি। আমার লোকেরা খাবারটা প্যাক করে দিতেই ভদ্রলোক তড়িঘড়ি পেমেন্ট চুকিয়ে দিলেন... মনে হয় ভদ্রলোকের খুব তাড়া ছিল। সবে ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় পা দিয়েছে চার পা-ও যায়নি, একটা ট্যাক্সি এসে পিছন থেকে ধাক্কা, ভদ্রলোক ছিটকে পড়ে যেতেই গাড়ির চাকায় মাথাটা একবারে থেতলে গেল। ইস্ কি বীভৎস দৃশ্য... চোখে দেখা যায় না... ট্যাক্সিওয়ালাটা পড়ি কি মরি করে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে পালিয়ে গেল। ব্যাটাকে ধরা গেল না, এটাই আফসোস।

কালীঘাট থানা থেকে পুলিশ এসে লাশটা নিয়ে গেল, এখন হসপিটাল তারপর মর্গে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে।

কার লোক, কোথায় থাকে, কে জানে?

লোকটার মুখে সব শোনার পর দেবারতি ওখানেই বসে পড়ল। লোকটাও ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল– কি হল ম্যাডাম, ভদ্রলোক কি আপনার চেনা? দেবারতি কোন উত্তর দিল না।

লোকটা আবার প্রশ্ন করল– আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ম্যাডাম? এই ভদ্রলোক কি আপনার কেউ হয়?

দেবারতি মাথা নেড়ে জানাল কেউ হয় না। পরে বলল– সবকিছু শুনে আমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, চোখে অন্ধকার দেখছিলাম।

দেবারতি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাম-রাস্তার দিকে চলতে শুরু করল। মোড়ের মাথায় এসে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল– এবার কোন্ দিকে যাওয়া যায়। না, দেবারতির আর কোন দিক জানা নেই, একটাই পথ জানা ডানদিকে পুষ্পমাসির আস্তানা, কিন্তু সেখানে কি ঠাঁই মিলবে? দেখা যাক, পুষ্পমাসির হাতে-পায়ে ধরলে একটা কিছু উপায় হবেই।

কালীঘাট ব্রিজের দিক থেকে একটা খালি ট্রাম টিংটিং শব্দ করতে করতে হাজরা মোড়ের দিকে চলে গেল। মনে হয় ঘণ্টাদেড়েক আগে দেখা ট্রামটাই ডিপোতে ফিরে যাচ্ছে। দেবারতিও পায়ে পায়ে ফিরে চলছে পুষ্পমাসির ডিপোতে। না, দেবারতি নয়, যে ফিরে চলেছে তার নাম 'কল্যাণী'। কিছুক্ষণের জন্য আবার দেবারতি হবার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হল না । দেবারতি, জেঠুর আদরের 'দেবা' আবার 'কল্যাণী' হবার পথে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলল।

নারায়ণ সাহা
ভারতের ছোটগল্পকার

হরিয়ানার লোককাহিনি

কৃষকের উপহার

হরিয়ানার ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করত এক কৃষক। কৃষকটি ছিল খুবই করিৎকর্মা। কাজ কাজ আর কাজ । কাজ ছাড়া কিছুই বুঝত না সে। একবার সে ঢাউসমার্কা তরমুজ ফলালো। এর আগে এত বড় তরমুজ আর কখনও কেউ দেখেনি। তরমুজটি নিয়ে খুবই অহংকার কৃষকের।

কি করা যায় তরমুজটি নিয়ে! ভাবতে ভাবতে তরমুজটি বাজারে তোলার সিদ্ধান্ত নিল সে। প্রচুর টাকা পাবে তরমুজ বিক্রি করে। আবার ভাবল, বাজারে এত টাকা দিয়ে কে আর কিনবে তরমুজটি। তারচেয়ে তরমুজটি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাক।

আবশেষে কৃষক সিদ্ধান্ত নিল তরমুজটি রাজার কাছে নিয়ে যাওয়ার।

'কালকের জন্য অপেক্ষা করব না আমি! আমি নিশ্চিত রাজা আমাকে উপহার আর পুরস্কার দুটোই দেবেন।' ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল কৃষক।

রাজার অভ্যাস ছিল রাতের বেলা রাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর। ঘুরে ঘুরে তিনি দেখেন সবকিছু আর সবাই ঠিকঠাক আছে কি-না। ছদ্মবেশী রাজা চলতে চলতে কৃষকের জমির ধারে চলে এলেন। চোখে পড়ল ইয়া বড় তরমুজটি। হঠাৎ থেমে গেল তাঁর পা। সেই অবাক করা ফল দেখে রাজার চোখ ছানাবড়া। তিনি কি কৃষকের দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলবেন?

– আপনি কে? আর কেনই বা এতরাতে এখানে? কৃষক জিজ্ঞাসা করল।

– আমি একজন গরিব মানুষ। আমি তোমার তরমুজটি চাই। রাজা উত্তর দিলেন।

– তরমুজ চাও! না সেটি হবে না। কৃষক বলল।

– এটি তোমার কী কাজে লাগবে? রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

– আমি তরমুজটি রাজামশাইকে উপহার হিসেবে দিতে চাই, কৃষক উত্তর দিল।

– কিন্তু রাজা যদি এটি পছন্দ না করেন?

– তাহলে বুঝতে হবে রাজা এটিকে চিনতে পারেননি, কৃষক অবজ্ঞার স্বরে বলল।

এরপর রাজা চলে গেলেন এবং কৃষক আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল। কৃষক ঢাউস মার্কা তরমুজটি নিয়ে রাজপ্রাসাদে হাজির। কৃষক রাজাকে চিনতে পারল। কিন্তু সে এমন ভান করল যে কিছুই ঘটেনি। কুর্নিশ করে সে বলল, 'রাজামশাই, আমি আপনার জন্য একটি তরমুজ এনেছি। রাজ্যের মধ্যেই এটিই সবচেয়ে বড় তরমুজ। আপনার এটি পছন্দ হবে।'

– হুম! মাথা নাড়লেন রাজা। কিন্তু এটি যদি আমি পছন্দ না করি!

– এ প্রশ্নের উত্তর আপনার ভাল করেই জানা আছে রাজা মশাই। কৃষক বলল।

মুচকি হাসলেন রাজা। ঠিক আছে। আমি তোমার তরমুজটি গ্রহণ করলাম। এমন সুন্দর উপহার আমি ইতোপূর্বে কখনও পাইনি।

রাজা কৃষককে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। আর সেটি শুধু তার উপহারের জন্য নয়। সেটি তার ভদ্রতা আর উপস্থিত বুদ্ধির জন্য।

ভাষান্তর **বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান**

বিশেষ রচনা

যেমন করে গাইছে আকাশ

সালাম আজাদ

ব্যারিস্টার কিংবা আইসিএস হয়ে লন্ডন থেকে ফিরে না এলেও দেড় বছরে অনেকটা বড় হয়ে ফিরে এসেছেন রবি। শারীরিক গঠনে বড় হওয়ায় বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের আলোচনা ও উৎসবে অংশ নিতে কোন বাধা আসছে না।

শারীরিক গঠন বৃদ্ধির পাশাপাশি মনের যে বিকাশ লাভ– তা বহুগুণে বেশি। বিলাত যাবার আগে প্রায় ছ'মাস রবিকে থাকতে হয়েছিল আমেদাবাদ ও মুম্বইতে মেজদাদার কাছে। সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করেন। আমেদাবাদের শাহিবাগে তার সরকারি বাসভবন। বাদশাহী আমলে নির্মিত, বাদশাহর জন্যই নির্মিত এই ভবন। সবরমতী নদীর দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগ, সঙ্গে প্রাসাদের একটি বড় খোলা ছাদ। বৌঠাকরুন জ্ঞানদানন্দিনী তখন বিলেতে। মেজদাদা আদালতে চলে যাবার পরে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদে রবি ছাড়া আর কেউ নেই। রবি মুগ্ধ হয়ে একদল পায়রার মধ্যাহ্ন কূজন শুনতেন। অকারণ কৌতূহল নিয়ে শূন্য ঘরগুলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো প্রকাণ্ড ছাদে ওঠে সবরমতীর সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। একটি বড় ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বই সাজানো। সেখান থেকে বই নিয়ে রবি পড়তে শুরু করলেন। পাশে একটি ডিকশনারি।

ইংরেজি বইয়ের অপরিচিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দগুলি ডিকশনারির সাহায্যে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। সব সময় যে সম্পূর্ণ বুঝতে পারতেন, তা নয়। কিন্তু বুঝতে না পারলেও তাঁর পড়ায় কোন ব্যাঘাত ঘটত না।

শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোট ঘর ছিল রবির শোবার ঘর। এই ঘরটিতে একটি বোলতার চাক ছিল। কোন কোন দিন রাতে শোবার পরে চাক থেকে দু'একটা বোলতা রবির বিছানায় এসে পড়ত। পাশ ফিরলেই বোলতা প্রীত হত। কিন্তু রবির পক্ষে ব্যাপারটা বড্ড অপ্রীতিকর হত।

পূর্ণিমার রাতে সবরমতী নদীমুখী প্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাদে রবি একা ঘুরে বেড়াতেন। এই ছাদে একা নিশাচর্য করবার সময়ই নিজের সুর দেওয়া প্রথম গানগুলি রচনা করেন রবি।

আমেদাবাদ থেকে মুম্বই। এখানে বিলেতি কেতা শেখার জন্য ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ-এর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন রবি। আত্মারামের তিনটি মেয়ে– আনা, দুর্গা ও মানিক। তিন মেয়েকে বিলেত থেকে বিদ্যা শিক্ষা করিয়ে এনেছিলেন তিনি। আত্মারাম শুধু চিকিৎসক ছিলেন তা নয়, তাঁদের পরিবার মুম্বই অঞ্চলে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাই দাদোবা পাণ্ডুরঙ জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুরীতি উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে 'পরমহংস সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভা এক সময় ভেঙে গেলে ডাক্তার আত্মারাম তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম যখন সস্ত্রীক মুম্বই যান, তখন মানকজী করসদজী নামে এক সম্ভ্রান্ত পার্সি ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। এখানেই ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। সে-সময় বন্ধুর মেয়ে আনাকে রবির ইংরেজি শিক্ষক ও বিলেতি কেতা শেখানোর গভর্নেস হিসেবে মনোনীত করেন। মেজদাদার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রবির মত কিছুটা ভিন্ন।

তিনি মনে করেন, আমেদাবাদে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই রকম মেয়েদের সঙ্গে রবিকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শিখবার সেই হবে সহজ উপায়। মুম্বইয়ের যে বাড়িতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সে বাড়ির একটি মেয়ে, অবশ্যই আনা– এখনকারকালের পড়াশোনা, ঝকঝকে করে মেজে এনেছিল তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আনা বিলেত গিয়েছিলেন রবির দু'বছর আগে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। রবি ১৮৭৮-এ বিলেতে তিনি আর্নস ভ্যালে সেমিটরিতে সমাহিত রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন ১৮৭৬-এর ২৬ আগস্ট। অগ্রবর্তী রিফর্মিস্ট রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি আনা ও তাঁর বাবা শ্রদ্ধা জানানোর পরে ভিডিটর্স বুকে স্বাক্ষরও করেছিলেন।

এরপরে রবি লিখেছেন, আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেননি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মত পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই রবি জানিয়ে দিতেন কবিতা লিখবার হাত রয়েছে তাঁর। আদর আদায় করবার সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় মূলধন। আনা রবির কবিপ্রতিভাকে মেপে দেখার দরকার মনে করেননি। বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন।

রবির 'কবি কাহিনী' যখন নতুনদাদার উদ্যোগে প্রকাশিত হয় তখন তিনি বিলেতে। আনা বইটির এক কপি উপহার হিসেবে পাওয়ার পরে নতুনদাদাকে একটি চিঠি লেখেন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বরে। বলা বাহুল্য, 'কবিকাহিনী'র প্রায় সব কবিতাই নতুনদাদার উদ্যোগে *ভারতী*তে প্রকাশিত হয়েছিল। আনা জোতিরিন্দ্রনাথকে এই চিঠিতে লেখেন, *ভারতী*র পৃষ্ঠা থেকে 'কবিকাহিনী'র কবিতা রবি তাঁকে পাঠ করে শোনাতেন। ইংরেজি অনুবাদ করে তা আনাকে বুঝিয়ে দিতেন। রবির কাছে তাঁর বাংলা শিক্ষার সূচনাও হয়েছিল। বিলেতযাত্রার আগে *ভারতী*র সেই বিশেষ সংখ্যাগুলি আনাকে রবি উপহার দিয়েছিলেন। জোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা আনার চিঠি:

Bombay
65, Kandevadi
Novr, 26th [1878]

Dear sir,

I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th inst., with the copy of 'কবিকাহিনী' unacknowledged so long; but various causes, in the shape of illness, have combined to hinder me from doing so till the present moment, and even as I write this, I have fever upon me.

Thank you very much indeed for sending me the entire publication of 'কবিকাহিনী' though I have the poem myself in the number' of 'ভারতী', in which it was first published, and which Mr. Tagore was good enough to give me before going away; and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart.

You are under a misapprehension when you suppose that I have "learnt" Bengali. I was only a beginner, for ill-health has come in the way of my studies, and I have had to cease continuing them.

Believe me
Yours sincerely
Ana Turkhud.

আনার এই চিঠি প্রথম জীবনের কখনো দেখেছিলেন কিনা তা বলা কঠিন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হওয়ার পরে সজনীকান্ত দাসের সৌজন্যে চিঠিটি দেখার পরে রবি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর পুত্র রথীকে ডেকে পাঠালেন। চিঠিটি পুত্রকে দেখিয়ে বললেন, তোমরা যদি রবীন্দ্র যাদুঘর করতে চাও, এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও।

আনা রবির কাছে একটি বাংলা নাম চেয়েছিলেন। তিনি দিয়েছিলেন একটি বাংলা নাম– নলিনী। বহু কবিতা, কাব্য ও নাটকে রবি এই নামটি ব্যবহার করেছেন। রবির প্রেমে আনা ছিলেন মুগ্ধ। সেই মুগ্ধতা থেকেই তিনি রবিকে দাড়ি রাখতে বারণ করেছিলেন। দাড়ি রাখলে তোমার মুখের সীমানা ঢাকা পড়ে যায়। রবি লিখেছেন, তার মুখে অবাধ্যতা, দাড়ি প্রকাশ পাবার পূর্বেই আনার মৃত্যু হয়েছিল। রবির এই কথাটি ঠিক নয়। আনার মৃত্যু হয় ১৮৯১ সালের ৫ জুলাই। রবির বয়স তখন ত্রিশ। আনার জীবদ্দশায় রবির শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডলের দেখা পাওয়া যায় বিভিন্ন আলোকচিত্রে।

কেন রবিকে তিনি দাড়ি রাখতে নিষেধ করেছিলেন, তাঁর পরিবারে দাড়ি রাখার উদাহরণ রয়েছে বলে? হয়তো তাই। স্বয়ং পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল। আনা তা অবগত ছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় যদি তার রবিও দাড়ি রেখে ফেলে, তা হলে তার এই প্রিয় মুখমণ্ডল ঢাকা পড়ে যাবে। যে রবিকে উৎফুল্ল রাখার জন্য আনা পেছন দিক থেকে প্রায়ই চোখ টিপে ধরতেন। তার হাতের দস্তানা খুলে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সে দস্তানা খুলে নেয়, তার চুমু খাওয়ার অধিকার জন্মায়। তাও রবিকে জানিয়েছিলেন আনা।

সারা জীবনের আনার সঙ্গে রবির আর দেখা হয়নি। মুম্বইতে আনার সঙ্গে মাসতিনেকের রোমান্স তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন তাও নয়। মেজদার সঙ্গে মুম্বই থেকে জলপথে লন্ডন যাত্রার পুরো পথ ঘুরে ঘুরে আনা ফিরে এসেছেন রবির মানসপটে। লন্ডনে অবস্থানকালে পরের বছরই রবির কাছে খবর আসে হ্যারল্ড লিটলডেন নামে এক স্কচ অধ্যাপককে আনা বিয়ে করে দু'জনেই এডিনবরা চলে যান। রবি চাইলেই লন্ডন থেকে এডিনবরা গিয়ে আনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারেন। ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি ক্ষমতা তাঁর ছিল। এ ক্ষেত্রেও তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন কিন্তু কখনোই তাঁর হৃদয় থেকে আনা হারিয়ে যাননি। তাঁর দেয়া আনার বাংলা নাম 'নলিনী' বহুভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন। সদ্য বিবাহিত স্ত্রী ভবতারিণীর নাম প্রায় একই অর্থের নাম নলিনীকে স্মরণ করে মৃণালিনী রেখেছিলেন। রবির 'ভগ্নহৃদয়ে'র নায়িকা নলিনী। 'কবি কাহিনী'র নায়িকার নামও নলিনী। শুধু এই নাম রাখা কিংবা নামকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, হৃদয়ে গেঁথে রেখেছিলেন তাঁর নলিনী তথা আনাকে। তবে আনার সঙ্গে রবি'র সম্পর্কের দালিলিক প্রমাণ মাত্র একটিই, যা সজনীকান্ত দাস আবিষ্কার করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত্রের একটি ইংরেজি অনুবাদের কপি চোরা বাজার হতে সজনীকান্ত দাসের হাতে এলে, সেই কপির ভেতরই আনার চিঠিটি পাওয়া যায়। তা সত্যিই আনার চিঠি কিনা, সনাক্ত করার জন্য রবির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

অনায়াসেই তাঁর নলিনীর হস্তাক্ষর চিনতে পারেন রবি।

রবি লন্ডন থেকে দেশে ফিরে এসেছেন এক যুগের বেশি সময় আগে। ইতোমধ্যে তিনি সংসার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ব্যস্ত। প্রতিনিয়ত তাঁর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিলাইদহ-সাহজাদপুরের জমিদারীর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন পিতৃদেবের নির্দেশে। পাশাপাশি তাঁর গদ্য-পদ্য দুটোতেই লেখায় আরো বেশি সময় দিতে হচ্ছে। খ্যাতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আষাঢ় মাসের বর্ষা-বৃষ্টি রবির মনকে বেশ প্রসন্ন করে তুলেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বৃষ্টির সঙ্গে শিলাইদহের এই বর্ষণ, সঙ্গে আকাশে মেঘের গর্জন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে পদ্মার খরস্রোতের উল্লাসের কি কোন তুলনা চলে!

কিন্তু এই যুবক জমিদার ও রোমান্টিক কবির সব কিছু সদ্য পাওয়া মৃত্যু সংবাদটি তছনছ করে দিচ্ছে। বুকের ভেতরে এক অব্যক্ত কষ্ট কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। কিন্তু রবি তা দমন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। পারছেন কৈ? সব রকম কষ্টের নিয়ন্ত্রণ করার একটি মাত্রই পথই জানা আছে তাঁর। তিনি তাই শুরু করলেন মুষলধারার বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে। তিনি লিখতে শুরু করলেন, 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ...। সমগ্র শিলাইদহের আকাশ যেন ক্যান্সারে আনার মৃত্যু সংবাদ শুনে অঝোরধারায় কাঁদছে। আনার দুই শিশু কন্যাসন্তান সুদূর এডিনবরায়, কতটা শোক করছে, কষ্ট পাচ্ছে, তা রবির জানা নেই।

সালাম আজাদ কথাসাহিত্যিক

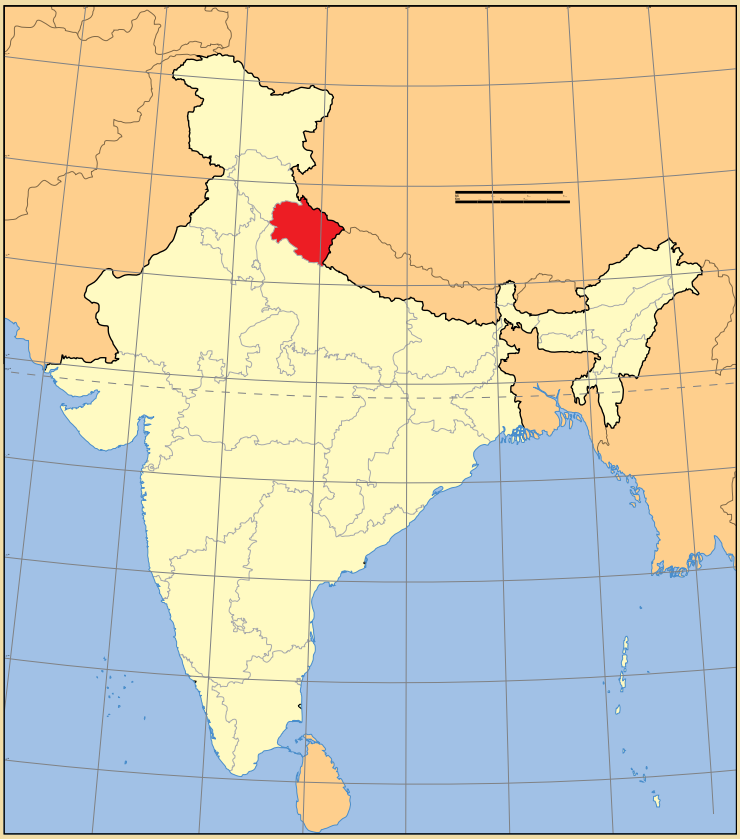

এক নজরে উত্তরাখণ্ড

দেশ	ভারত
রাজধানী	দেরাদুন
জেলা	১৩টি
প্রতিষ্ঠা	৯ নভেম্বর ২০০০
সরকার	
• শাসকবর্গ	উত্তরাখণ্ড সরকার
• রাজ্যপাল	কৃষণকান্ত পাল
• মুখ্যমন্ত্রী	ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত (বিজেপি)
• বিধানসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট (৭১টি আসন)
• সংসদীয় ক্ষেত্র	রাজ্যসভা ৩, লোকসভা ৫
• হাই কোর্ট	উত্তরাখণ্ড হাই কোর্ট
ক্ষেত্রফল	
• মোট	৫৩,৪৮৩ বর্গকিমি (২০,৬৫০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	১৯তম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	১,০০৮৬,২৯২
• ক্রম	২০তম
• ঘনত্ব	১৮৯/বর্গকিমি (৪৯০/বর্গমাইল)
• ঘনত্বের ক্রম	২০তম
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-UT
যানবাহন নিবন্ধন	UK 01—XX
সরকারি ভাষা	হিন্দি, সংস্কৃত (অতিরিক্ত)
ওয়েবসাইট	www.uk.gov.in

কৃষণকান্ত পাল

ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত

রাজ্য পরিচিতি

উত্তরাখণ্ড

উত্তরাঞ্চল নামে একদা পরিচিত উত্তরাখণ্ড ভারতের উত্তরাংশের একটি রাজ্য। গোটা রাজ্যে অসংখ্য মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত হওয়ায় প্রায়শ একে দেবভূমি বলে উল্লেখ করা হয়। হিমালয় ভাবর ও তরাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য উত্তরাখণ্ড বিখ্যাত। ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর উত্তরাখণ্ড উত্তর প্রদেশের হিমালয় এবং সন্নিহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলি নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ২৭তম রাজ্যে পরিণত হয়। এর উত্তরে তিব্বত, পূর্বে নেপালের ৭ নং প্রদেশ, দক্ষিণে ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হরিয়ানা অবস্থিত। রাজ্যটি ১৩টি জেলা নিয়ে ২টি বিভাগে বিভক্ত–গাড়োয়াল ও কুমায়ুন। উত্তরাখণ্ডের অন্তর্বর্তী রাজধানী দেরাদুন, এটি রাজ্যের সর্ববৃহৎ নগর, যেখানে রেললাইন আছে। রাজ্যের হাই কোর্ট নৈনিতালে অবস্থিত।

দেরাদুনের জলি গ্রান্ট বিমানবন্দর

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের গঙ্গাস্নান

প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই এখানে মানুষের অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভারতের বৈদিক যুগে এ অঞ্চল কুরু ও পাঞ্চাল রাজ্যের (মহাজনপদ) অংশ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কুমায়ুনের রাজবংশগুলির অন্যতম প্রধান ছিলেন কুনিন্দরা– এঁরা ছিলেন শৈব। কালসিতে প্রাপ্ত অশোকের শিলালিপি থেকে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগে অঞ্চলটি কুমায়ুন রাজ্য ও গাড়োয়াল রাজ্যে ক্ষমতায়িত হয়।

১৮১৬ সালে আধুনিক উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল সুগাউলির চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশদের করতলগত হয়। ভূতপূর্ব পার্বত্য কুমায়ুন ও গাড়োয়াল রাজ্য ঐতিহ্যগতভাবে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হলেও প্রতিবেশী জাতিগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নৈকট্য তাদের ভূগোল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য গভীর বন্ধনের সৃষ্টি করে। এ বন্ধন আরও দৃঢ়বদ্ধ হয় ১৯৯০-এর দশকে উত্তরাখণ্ড আন্দোলন চলাকালে।

রাজ্যের বাসিন্দাদের সাধারণত উত্তরাখণ্ডী বলে অভিহিত করা হয়। তবে অঞ্চলভিত্তিক কুমায়ুনী বা গাড়োয়ালী নামেও চিহ্নিত হয়। ২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডের জনসংখ্যা ১ কোটি ৮৬ হাজার ২ শো ৯২– জনসংখ্যা ক্রম অনুযায়ী এটি ভারতের ২০তম জনবহুল রাজ্য।

নামকরণ

উত্তরাখণ্ড সংস্কৃত শব্দটির অর্থ উত্তরাঞ্চলের ভূমি। প্রাচীন হিন্দু পুরাণে অঞ্চলটি কেদারখণ্ড (বর্তমান গাড়োয়াল) ও মানসখণ্ড (বর্তমান কুমায়ুন) নামে উল্লেখিত।

১৯৯৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার যখর রাজ্য পুনর্গঠনের কাজে হাত দেয়, তখন এর নামকরণ হয় উত্তরাঞ্চল। উত্তরাঞ্চল নামটি সরকারি কাজে ব্যবহৃত হলেও উত্তরাখণ্ড নামটি এতদ্‌অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ২০০৬ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা উত্তরাঞ্চল বিধানসভা এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দাবি মেনে উত্তরাঞ্চল রাজ্যের নামকরণ করেন উত্তরাখণ্ড নামে। নামটি ২০০৬ সালের অক্টোবরে উত্তরাঞ্চল বিধানসভায় পাশ হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করে। সংসদে বিলটি পাশ হওয়ার পর একই বছরের ডিসেম্বর মাসে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজ্যটি উত্তরাখণ্ড নামে পরিচিত হয়।

ইতিহাস

প্রাচীন প্রস্তরচিত্রকলা, প্রস্তরআশ্রয়, আদিম প্রস্তর যুগের অস্ত্র (লাখ লাখ বছরের পুরনো) ও নব্য প্রস্তর যুগের প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই এ পার্বত্য অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল। আদিম বৈদিক যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বছর) বিভিন্ন অনুশীলনের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। পৌরভ, কুশল, কুনিন্দ, গুপ্ত, গুর্জর, প্রতিহর, কাত্যুরি, রাইক, পাল, চাঁদ পারমার বা পানোয়ার এবং ব্রিটিশরা বিভিন্ন সময়ে উত্তরাখণ্ড শাসন করেন।

এ অঞ্চলের আদিবাসী কোল জনগোষ্ঠী। এদের শারীরিক সংস্থান অস্ট্রো-এশীয়। পরে বৈদিক যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০-১১০০) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ইন্দো-অর্থ খাস উপজাতীয়রা এদের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে-সময় বর্তমান উত্তরাখণ্ড মুনিঋষিদের বসতি ছিল। এখানেই ব্যাসদেব তাঁর মহাভারত রচনা করেছিলেন বলে লোকশ্রুতি। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের প্রথম দিককার প্রধান রাজবংশগুলির মধ্যে কুনিন্দরা ছিলেন। এঁরা ছিলেন শৈব এবং পশ্চিম-তিব্বতের সঙ্গে তাদের লবণের ব্যবসায় ছিল। পশ্চিম গাড়োয়ালের কালসিতে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভ থেকে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন দেখা যায়। শংকরাচার্য ও সমতল থেকে অভিবাসীদের আগমনের ফলে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে হিন্দু শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

চতুর্থ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী কালব্যাপী কাত্যুরিরাজবংশ কুমায়ুনের কাত্যুর (আজকের দিনের বৈজনাথ) উপত্যকা থেকে এতদ্‌অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করেন। কাত্যুরিদের শাসনামলে জগেশ্বরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্দির নির্মিত হয়। পরে চণ্ডরা এসবের সংস্কার করেন। তিব্বতী-বর্মা জনগোষ্ঠীর কিরাতরা উত্তরের উচ্চভূমিতে বসতি স্থাপন করে। এরা আজকের ভুটিয়া, রাজি, বক্সা ও থারু প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ।

মধ্যযুগে পশ্চিমে গাড়োয়াল ও পূর্বে কুমায়ুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় পাহাড়ি চিত্রকলার উদ্ভব হয়। আধুনিক গাড়োয়ালে যেমন পারমাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি সমতল থেকে আসা ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা কুমায়ুন রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। তেহরির একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে গাড়োয়াল রাজ্য পুনর্গঠিত হয় এবং অমর সিং থাপার নেপাল রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ইঙ্গ-নেপালি যুদ্ধের পর সুগাউলির চুক্তির ফলে এটি ব্রিটিশ রাজত্বে সংযুক্ত হয়।

ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর গাড়োয়াল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে একীভূত হয়, যেখানে উত্তরাখণ্ড গাড়োয়াল ও কুমায়ুন– এই দুই বিভাগে বিন্যস্ত হয়। ১৯৯৮ সালে উত্তরাখণ্ড নামটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে, উত্তরাখণ্ড ক্রান্তি দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পৃথক রাজ্যের দাবি তুলতে থাকে। ১৯৯৪ সালে স্থানীয় জনগণ ও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ঐকমত্যে উত্তরাখণ্ড আন্দোলন বেগবান হয়। তারপর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর উত্তরাখণ্ড ভারতের ২৭তম রাজ্যে পরিণত হয়।

ভূগোল

উত্তরাখণ্ডের মোট ক্ষেত্রফল ৫৩ হাজার ৪ শো ৮৩ বর্গ কিলোমিটার, যার ৮৬ শতাংশ পার্বত্য এবং ৬৫ শতাংশ অরণ্য-আচ্ছাদিত। রাজ্যের উত্তরভাগের অধিকাংশ এলাকাজুড়ে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ এবং হিমবাহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সড়ক, রেল ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে নির্বিচার বৃক্ষনিধনে বিশেষত হিমালয় অঞ্চল হুমকির সম্মুখীন হয়। উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে হিন্দু

দেরাদুনের অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমি

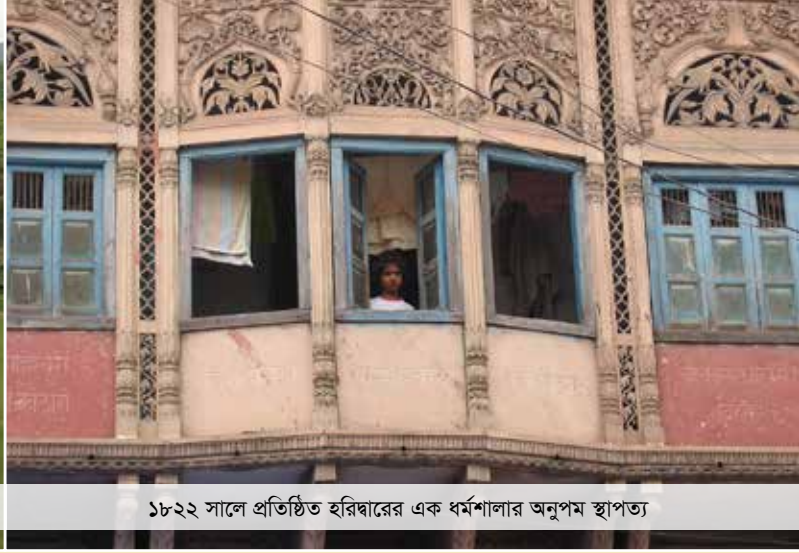

১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হরিদ্বারের এক ধর্মশালার অনুপম স্থাপত্য

ধর্মের দুই পবিত্র নদী গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি হয়। এর সঙ্গে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মিলে হিন্দুদের চার তীর্থক্ষেত্র ছোট চারধাম গঠিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যান জিম করবেট জাতীয় উদ্যান হচ্ছে বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। গাড়োয়াল এলাকার যোশীমঠের কাছে ভাউন্দর গঙ্গার উত্তরাংশে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ফুলের উপত্যকা (ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স) বিভিন্ন ফুল ও গাছ-গাছালির জন্য বিখ্যাত। কিউ-এর রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের পরিচালক স্যার জোসেফ ডাল্টন হুকার প্রথম এ এলাকার অভিনবত্বের কথা সবার গোচরে আনেন। তারই ফলশ্রুতিতে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৫ সালে ভারতীয় বন চার্টার ইস্যু করেন। এরই হাত ধরে ১৮৭৮ সালে ভারতীয় বন আইন পাশ হয়। এর বছরেই দিয়েত্রিস ব্রানডিস দেরাদুনে ইমপেরিয়াল ফরেস্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯০৬ সালে যা ইমপেরিয়াল ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে নামাঙ্কিত হয়। এটি এখন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ভারত) নামে পরিচিত।

প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত দেরাদুনভিত্তিক 'অরণ্যবৃত্ত'র মডেলটি এলাকার বনাঞ্চল ও প্রতিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। হিমালয়ান প্রতিবেশ ব্যবস্থায় নানা প্রাণি (ভারল, তুষারচিতা, চিতা ও বাঘসহ), উদ্ভিদ ও বিরল ভেষজ প্রতিপালিত হয়।

উত্তরাখণ্ড হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত। উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু ও গাছপালার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে আধা- উষ্ণমণ্ডলীয় বন এবং উচ্চতম শৃঙ্খ তুষারাবৃত। তুষার শৃঙ্গের নীচে ৩-৫ হাজার মিটার উচ্চতায় পশ্চিম হিমালয়ান আলপাইন গুল্ম ও তৃণভূমি রয়েছে। এই তরুশ্রেণির ঠিক পরেই ৩ হাজার থেকে ২৬ শো মিটার উচ্চতায় আছে নাতিশীতোষ্ণ পশ্চিম হিমালয়ান সাব-আলপাইন কনিকার ফরেস্ট। এর নিচে আছে হিমালয়ান সাব-ট্রপিক্যাল পাইন ফরেস্ট। এরপর উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত বরাবর রয়েছে উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির বাষ্পীয় পত্রমোচী অরণ্য এবং শুষ্ককর তরাই–ডুয়ার সবানা ও তৃণভূমি। এ অঞ্চলটি স্থায়ীয়ভাবে ভাবর নামে পরিচিত। নিম্নাঞ্চলের বনভূমির অধিকাংশই কৃষিকাজের জন্য আবাদ করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু বনভূমি এখনও রয়ে গেছে।

জনমিতি

উত্তরাখণ্ডের মানুষকে সাধারণত উত্তরাখণ্ডী নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে আরও সুনির্দিষ্টভাবে কুমায়ুনের লোকদের কুমায়নী এবং গাড়োয়ালের লোকদের গাড়োয়ালী বলে সম্বোধন করা হয়। ২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডের জনসংখ্যা ১ কোটি ৮৬ হাজার ২ শো ৯২, যার মধ্যে পুরুষ ৫১ লাখ ৩৭ হাজার ৭ শো ৭৩ জন আর নারী ৪৯ লাখ ৪৮ হাজার ৫ শো ১৯ জন। জনসংখ্যার ৬৯.৭৭ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। এটি ভারতের ২০তম জনবহুল রাজ্য। ২০০১-১১ দশকে এখানে প্রতিকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১৮৯ জন এবং বৃদ্ধির হার ১৮.৮১ শতাংশ। লিঙ্গ অনুপাত প্রতি ১ হাজার পুরুষে ৯৬৩ জন নারী।

জাতিগত গোষ্ঠী

উত্তরাখণ্ডে বহু জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস– গাড়োয়াল ও কুমায়ুন দুই ভূ-সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিস্তৃত। জনসংখ্যার একটা বড় অংশ রাজপুত (অনেক গোষ্ঠী ভূতপূর্ব জমিদার শাসক ও তাদের অধস্তন পুরুষ), এছাড়া আছে স্থানীয় গাড়োয়ালী ও কুমায়নী জনগণ; আছে গুর্জর সম্প্রদায়ের মানুষ আর আছে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত। উত্তরাখণ্ডে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অনেক– মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। এখানে তপসিলি সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা কম নয়– ১৮.৭৬ শতাংশ। এছাড়া আছে থারু, জৌনসারি, বুক্সা, ভুটিয়া ও রাজি প্রভৃতি তপসিলি উপজাতি, জনসংখ্যার ২.৮৯ শতাংশ।

ভাষা

২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে ৮৭.৯৫% মানুষ হিন্দি, ৫.৮৬ শতাংশ উর্দু, ২.৯১ শতাংশ পাঞ্জাবি, ১.৪৫ শতাংশ বাংলা, ১.০৭ শতাংশ নেপালি ভাষায় কথা বলে। হিন্দি হচ্ছে ইন্দো-আর্য ভাষা যা রাজ্যের সরকারি ভাষা। গাড়োয়ালী, কুমায়ুনী, জৌনসারিরা হিন্দিভাষী। সংস্কৃত দ্বিতীয় সরকারি ভাষা। ভোটী, জাড, রাঙ্কা, ডার্মিয়া, বিয়াংসি ও চৌদাংসির মত তিব্বতী-বর্মী ভাষাও এ অঞ্চলে প্রচলিত।

ধর্ম

২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে হিন্দু (৮২.৯৭ শতাংশ), মুসলমান (১৩.৯৫ শতাংশ), শিখ (২.৩৪ শতাংশ), খ্রিস্টান (০.৩৭ শতাংশ), বৌদ্ধ (০.১৫ শতাংশ) ও অন্যান্য ধর্ম বা ধর্মহীন (০.১৩ শতাংশ) মানুষের বসবাস।

সরকার ও রাজনীতি

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত বিধায় রাজ্যপাল কৃষ্ণকান্ত পাল সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিক সরকার প্রধান। তবে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। এক কক্ষবিশিষ্ট বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৭১। এ রাজ্যর লোকসভা ও রাজ্যসভায় আসন যথাক্রমে ৫ ও ৩। উত্তরাখণ্ড হাই কোর্ট নৈনিতালে অবস্থিত। ২০১৭ সালের ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ত্রিবেন্দ্র রাওয়াত উত্তরাখণ্ডের চতুর্থ বিধানসভায় ৮ম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। দুই বিভাগে নিম্নোক্ত জেলাগুলি অর্ন্তভুক্ত:

কুমায়ুন বিভাগ: আলমোড়া, বাগেশ্বর, চম্পাবত, নৈনিতাল, পিথোরগড়, উধম সিং নগর।

গাড়োয়াল বিভাগ: দেরাদুন, হরিদ্বার, তেহরি গাড়োয়াল (তেহরি নামে সুবিদিত), উত্তরকাশী, চামোলী, পৌরি গাড়োয়াল (পৌরি নামে পরিচিত) ও রুদ্রপ্রয়াগ।

এ ছাড়া দিদিহাট, কোটদ্বার, রানিখেত ও যমুনোত্রী নামে ৪টি নতুন জেলা গঠিত হতে যাচ্ছে।

জগেশ্বরে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক মন্দির

গুরুদুয়ারা হেমকুণ্ড সাহিব– শিখদের এক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান

সংস্কৃতি

উত্তরাখণ্ডের বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর কারণে হিন্দি, কুমায়ুনী, গাড়োয়ালী, জৌনসারি ও ভোটি ভাষায় সাহিত্য চর্চা চলে। গীতিকবিতা আকারে অনেক ঐতিহ্যবাহী গল্প প্রচলিত রয়েছে। গঙ্গপ্রসাদ বিমল, মনোহর শ্যাম যোশী, প্রসূন যোশী, শেখর যোশী, শৈলেশ মাটিয়ানি, শিবানী, সংগীত-নাটক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মোহর উপ্‌রেতি, বিএম শাহ, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মঙ্গলেশ দাবরাল এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত সুমিত্রানন্দন পন্থ এ অঞ্চলের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক। প্রখ্যাত দার্শনিক ও পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণা ও বন্দনা শিব উত্তরাখণ্ডের মানুষ। ববি ক্যাশ দেশবিখ্যাত গায়ক।

এ অঞ্চলের নাচ মানব জীবন ও মানবদেহের সমন্বিত ভাবনাব্যঞ্জনাময়। লংবীর নৃত্য পুরুষদের নাচ– অনেকটা শারীরিক কসরতের মত। বরদা নতি লোকনৃত্য হচ্ছে জৌনসার-বাওরদের আরেক ধরনের নাচ যা ধর্মীয় উৎসবের সময় পরিবেশিত হয়। অন্যান্য সুপরিচিত নাচের মধ্যে আছে হুড়কা বাউল, ঝোরা চাঁচরি, ঝুমাইলা, চৌফুলা, ছোলিয়া। সংগীত হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনপ্রিয় লোকসংগীতের মধ্যে আছে, মঙ্গল, বাসন্তী, খুদের ও ছোপাতি। এসব লোকগীতি ঢোল, দামাউ, তুরি, রোসিংঘা, ঢোলকি, দৌর, থালি, ভাংকোরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গীত হয়। 'বেদু পাকো' উত্তরাখণ্ডের একটি জনপ্রিয় লোকসংগীত যা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করছে। কিংবদন্তীর মর্যাদা লাভকারী এ লোকসংগীতটি বলতে গেলে উত্তরাখণ্ডের বেসরকারি জাতীয় সংগীত। এছাড়া ঈশ্বর বন্দনার জন্য আছে জাগর বা জগরিয়া– ঈশ্বর প্রশস্তিমূলক গান। এতে মহাভারত ও রামায়ণের নানা কাহিনি গীত হয়। নরেন্দ্র সিং নেগী এবং মীনা রানা উত্তরাখণ্ডের দুই বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী।

উত্তরাখণ্ডের দারুশিল্প বিখ্যাত। এখানকার মন্দিরে মন্দিরে কাঠের নানা রকমের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে পাহাড়ি চিত্রকলা বিকাশ লাভ করে। মোলা রাম কাংড়া চিত্ররীতির গাড়োয়াল শাখার চর্চা শুরু করেন। গুলের রাজ্য হচ্ছে কাংড়া চিত্রকলার উৎপত্তিস্থল। কুমায়ুনী শিল্পকলা অনেকটা জ্যামিতিক। অন্যবিদ্যা গাড়োয়ালী শিল্পকলা প্রকৃতিঘনিষ্ঠ।

হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বার কুম্ভমেলা উত্তরাখণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের যে ৪টি স্থানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়, হরিদ্বার তার অন্যতম। হরিদ্বার ২০১০ সালের ১৪ জানুয়ারি থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত (মকর সংক্রান্তি থেকে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত) পূর্ণকুম্ভ মেলার আয়োজন করে। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার বিদেশী বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ বলে বিবেচিত এ উৎসবে যোগ দেন। কুমায়ুনী হোলির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বৈঠকি হোলি, খাড়ি হোলি ও মাহিলা হোলি। বসন্ত পঞ্চমী থেকে শুরু হয়ে এ উৎসব প্রায় মাসখানেক চলে। গঙ্গা দশহরা, বসন্ত পঞ্চমী, মকর সংক্রান্তি, ঘী সংক্রান্তি, খাটারুয়া, ভাট সাবিত্রী ও ফুল দেই অন্যান্য প্রধান উৎসব। এছাড়া কনোয়ার যাত্রা, কোন্দলি উৎসব, রম্মন, হারেলা মেলা, নওচণ্ডি মেলা, গিদ্দি মেলা, উত্তরায়নী মেলা এবং নন্দা দেবী রাজ জাত মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অর্থনীতি

উত্তরাখণ্ড হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল রাজ্য। রাজ্যের গড় দেশজ উৎপাদন ২০০৫-এর তুলনায় ২০১২-য় দ্বিগুনের বেশি– ২৪ হাজার ৭ শো ৮৬ কোটি রুপি থেকে বেড়ে ৬০ হাজার ৮ শো ৯৮ কোটি রুপি। প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডের মাথাপিছু আয় ছিল ১ লাখ ৩ হাজার রুপি, যা জাতীয় গড়ের (৭৪ হাজার ৯ শো ২০ রুপি) চেয়ে বেশি।

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের মত উত্তরাখণ্ডের অর্থনীতিতে কৃষি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাঁশমতি চাল, গম, সয়াবিন, চিনা বাদাম, মোটা শস্য, ডাল ও তৈলবীজ ব্যাপক উৎপাদিত শস্য। আপেল, কমলা, নাশপতি, পিচ, লিচু ও পাম প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এসব খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লিচু, উদ্যানপালিত ফলমূল, গুল্ম, ঔষধের গাছ-গাছড়া ও বাঁশমতি চালের জন্য কৃষি রপ্তানি এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আখ চাষ রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিকাজ। রাজ্যের ৮৬ শতাংশ ভূমি পার্বত্য হওয়ায় কৃষিজমির পরিমাণ কম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে পর্যটন ও জলবিদ্যুৎ অন্তর্ভুক্ত। আইটি, আইটিইএস, বায়োটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যালস ও অটোমোবাইল শিল্প বিকাশমান। চাকরির খাতগুলো হচ্ছে পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, উচ্চশিক্ষা ও ব্যাংকিং।

ইতোমধ্যে হরিদ্বার, পন্থনগর ও সিতারগঞ্জে ৩টি সমন্বিত শিল্প এলাকা, সেলাকুইয়ে ফার্মা সিটি (ঔষধ নগর) সহস্রধারা (দেরাদুন)-য় তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক এবং সিগাড্ডি (কোটদ্বার)-তে একটি গ্রোথ সেন্টার গড়ে উঠেছে।

প্রাণি ও উদ্ভিদ

উত্তরাখণ্ড প্রাণি ও উদ্ভিদ সম্পদে ভরপুর বৈচিত্র্যময় একটি রাজ্য। এর মোট বনভূমির পরিমাণ ৩৪ হাজার ৬ শো ৬৬ বর্গ কিলোমিটার, যা রাজ্যের মোট ক্ষেত্রফলের ৬৫ শতাংশ। উত্তরাখণ্ড বিরল প্রাণি ও উদ্ভিদের বাসস্থান। বিভিন্ন স্যাংচুয়ারি ও সংরক্ষণশালায় এ-সবের সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে জিম করবেট উদ্যান সবচেয়ে পুরনো। এটি নৈনিতাল জেলার রামনগরে অবস্থিত। চামোলি জেলার ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স জাতীয় উদ্যান এবং নন্দা দেবী জাতীয় উদ্যান– এ দু'টি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান। ঝাড়খণ্ড ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না এমন কয়েকটি আন্তর্জাতিকভাবে বিপন্ন উদ্ভিদসহ বিপুলসংখ্যক উদ্ভিদ প্রজাতি হরিদ্বার জেলার রাজাজি জাতীয় উদ্যান এবং উত্তরকাশী জেলার গোবিন্দ পশু বিহার জাতীয় উদ্যান ও স্যাংচুয়ারি এবং গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যানে পাওয়া যায়।

বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে চিতাবাঘ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে তারা নিচের সমভূমিতে কখনো কখনো নেমে আসে। এছাড়াও আছে বন বিড়াল, উদ্‌বিড়াল ও চিতা বিড়াল। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আছে হরিণ (বার্কিং ডিয়ার, সম্বর, হগ ও চিতল), স্লথ ও হিমালয়ান কালো ভল্লুক, ভারতীয় ধূসর বেজি, ওটার, হলুদে গলার মার্টেন, ভারল (পাহাড়ি

বুগিয়ালের এক অনুপম নৈসর্গিক দৃশ্য

বিভডাল্ল গ্রাঞ্জ বাগানে রডোডেনড্রনগুচ্ছ

ছাগল), বনরুই, লেঙ্গুর ও রেসাস বানর। গ্রীষ্মকালে শত শত হাতি লতাগুল্মের জঙ্গলে চরতে বেরোয়। কুমীর, ঘড়িয়াল ও অন্যান্য সরীসৃপ এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। কুমীর প্রজনন কেন্দ্রে বাচ্চা ফুটিয়ে রামগঙ্গা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অনেক প্রজাতির মিঠাজলের কচ্ছপ এ অঞ্চলের নদীগুলোতে পাওয়া যায়। হরেক রকম প্রজাপতি ও পাখি যেমন রেড হেলেন, গ্রেট এগফ্লাই, টাইগার বাটারফ্লাই, সাদা প্রজাপতি, জঙ্গল বাবলার, হলুদ বাবলার, কাঠঠোকরা, লাভ বার্ড, কমলা বুকের সবুজ কবুতর ও বুলবুলি এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। ২০১১ সালে জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে বিন গুজ নামে একটি বিরল পরিযায়ী পাখি দেখা যায়।

চিরহরিৎ ওক, রডোডেনড্রন ও কনিফার পাহাড়ের প্রধান বৃক্ষ। শাল, শিমুল, শিশুগাছ, আকাশিয়া, পলাশও জন্মে। মহুয়া মিষ্টি মধুযুক্ত ফুল– স্লথ ভল্লুকের খুব প্রিয়। অধ্যাপক চন্দ্রপ্রকাশ কালে এক দশকের গবেষণায় জানিয়েছেন, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সে ৫২০ প্রজাতির দীর্ঘতর বৃক্ষ এবং ৪৯৮ প্রজাতির পুষ্পবৃক্ষ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির ওষুধ প্রস্তুতকারী উদ্ভিদও পাওয়া যায়।

পরিবহন

উত্তরাখণ্ডে সড়কপথের দৈর্ঘ্য ২৮ হাজার ৫ শো ৮ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১ হাজার ৩ শো ২৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক এবং ১ হাজার ৫ শো ৪৩ কিলোমিটার রাজ্য মহাসড়ক। উত্তরাখণ্ড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান অংশীদার। বেসরকারি বিভিন্ন রুটে প্রায় ৩ হাজার বাস চলাচল করে, এছাড়া অটো রিকসা ও সাইকেল রিকসা তো আছেই।

দেরাদুন রেলওয়ে স্টেশন উত্তরাঞ্চলীয় রেলওয়ের সর্বশেষ গন্তব্য। দিল্লি-দেরাদুন ও হাওড়া-দেরাদুন রেলপথে হরিদ্বার স্টেশন অবস্থিত। অন্যান্য রেল স্টেশনগুলি হচ্ছে হৃষিকেশ, খোটদ্বার ও রামনগর। প্রতিদিন দিল্লি যাবার ট্রেন আছে।

রাজ্যে বিমানপথে যাতায়াতের নেটওয়ার্ক ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। দেরাদুনের জুলি গ্রান্ট এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লি এয়ারপোর্ট দিনে ৬টি ফ্লাইট আছে। কুমায়ুন অঞ্চলের পন্থনগরে অবস্থিত পন্থনগর বিমানবন্দর থেকে একটি ফ্লাইট আছে দিল্লি যাওয়া-আসার।

পর্যটন

হিমালয়ের অবস্থানের কারণে উত্তরাখণ্ডে অনেক পর্যটনস্থল রয়েছে। অনেক প্রাচীন মন্দির, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, পাবর্ত্য স্টেশন ও পর্বতশৃঙ্গ বিপুলসংখ্যাক পর্যটককে আকৃষ্ট করে। রাজ্যে ৪৪টি জাতীয়ভাবে সংরক্ষিত স্মারক রয়েছে। ওক গ্রোভ স্কুল শিগগিরই বিশ্ব ঐতিহ্য স্থলের তালিকায় স্থান পেতে যাচ্ছে। হিন্দুধর্মের দুই পবিত্র নদী গঙ্গা ও যমুনার উৎস উত্তরাখণ্ড।

উত্তরাখণ্ডকে দীর্ঘদিন থেকে দেবভূমি বলা হয়ে থাকে এর কয়েকটি প্রাচীন পবিত্রতম মন্দিরের জন্য, কোন কোনটির প্রাচীনত্ব হাজার বছরের চেয়েও বেশি– তীর্থযাত্রীরা পাপ খণ্ডনের জন্য এসব দর্শনে আসেন। গঙ্গা ও যমুনার উৎসমুখ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী রাজ্যের উত্তরাংশে একত্রিত হয়ে বদ্রীনাথ (বিষ্ণুকে উৎসর্গিত) ও কেদারনাথ (শিবকে উৎসর্গিত) ছোট চার ধামের সৃষ্টি করেছে। ছোট চার ধাম হিন্দুধর্মের সবচেয়ে অধ্যাত্মিক ও পবিত্র তীর্থকেন্দ্র। হরিদ্বার (ঈশ্বরের দরজা) হচ্ছে হিন্দুদের প্রধান গন্তব্যস্থল। হরিদ্বারে প্রতি বারো বছরে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে যাকে, যেখানে ভারতসহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লাখ লাখ পুণ্যার্থী সমবেত হন। হরিদ্বারের কাছে হৃষিকেশ ভারতের শ্রেষ্ঠ যোগকেন্দ্র। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ ও কিংবদন্তীর উল্লেখ থেকে এখানে শিব ও দুর্গার মূর্তিসংবলিত মন্দির রয়েছে। রুড়কির কাছে পিরান কালিয়ার শরিফ মুসলমানদের তীর্থ, গুরুদোয়োরা হেমকুণ্ড সাহিব, গুরুদোয়ারা নানক মাট্টা সাহিব ও গুরুদোয়ারা রিঠা সাহিব শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। দেরাদুনের ক্লিমেট শহরে মিনড্রোলিং বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ স্তূপ পুনর্নির্মাণ তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি প্রমাণ করে। উল্লেখ্য, ক্লিমেট হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৈলশহর।

উত্তরাখণ্ডে কয়েকটি অতি পরিচিত শৈলনিবাস রয়েছে। মসৌরি, নৈনিতাল, ধানউল্‌তি, চক্রতা, তেহেরি, ল্যান্সডাউন, পৌরি, সাত্তাল, আলমোড়া, কৌসানি, ভিমতাল ও রানিখেত উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি শৈলনিবাস। আউলি ও মুনসিয়ারি হচ্ছে রাজ্যের সুপরিচিত স্কিয়িং রিসোর্ট। রাজ্যে ১২টি জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণশালা রয়েছে– রাজ্যের মোট এলাকার ১৩.৮ শতাংশ এসবের দখলে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যান জিম করবেট জাতীয় উদ্যান প্রধান পর্যটন আর্কষণস্থল। পাহাড়ে চড়া, হাইকিং, হৃষিকেশে র‍্যাফ্‌টিং, স্কিয়িং, ক্যাম্পিং, প্যারা গ্লাইডিং-এর সব বন্দোবস্ত এ রাজ্যে রয়েছে। রূপকুণ্ড একটি ট্রেকিং সাইট। রূপকুণ্ড হ্রদে একটি রহস্যজনক কংকাল আছে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল এ রহস্যময় কংকালের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রচার করেছে। বুগিয়ালের তৃণভূমি দিয়ে রূপকুণ্ড হ্রদ প্রবাহিত। এ রাজ্যে অনেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দেরাদুন ভারতের স্কুলের রাজধানী হিসেবে পরিচিত– এখানে ১৫ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

ক্রীড়া

উত্তরাখণ্ডের উঁচু পাহাড় ও নদী পর্যটক ও অভিযানপ্রিয় মানুষকে আকৃষ্ট করে। প্যারা গ্লাইডিং, স্কি, ডাইভিং, র‍্যাফ্‌টিং ও বাঙ্গি জাম্পিংয়ের মত অভিযানমূলক খেলাধূলার প্রিয় গন্তব্য। অতি সম্প্রতি গল্‌ফ খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে– রানিখেত হয়ে উঠেছে পছন্দের গন্তব্য। উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট এসোসিয়েশন, উত্তরাখণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশন যথাক্রমে উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট দল ও ফুটবল দল পরিচালনা করে থাকে। উত্তরাখণ্ড ফুটবল সন্তোষ ট্রফি ও অন্যান্য লিগে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

সূত্র উত্তরাখণ্ড সরকারি ওয়েবসাইট
অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না–
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।
প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয়, হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পদাতিক কবি রাজনৈতিক কর্মী

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বাঙালি কবি ও গদ্যকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে, মামাবাড়িতে। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা জানকীবালা দেবী। পিতা ছিলেন সরকারি আবগারি বিভাগের কর্মচারী; তাঁর বদলির চাকরির সুবাদে সুভাষের ছেলেবেলা কাটে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। ছেলেবেলার প্রথম দিকটা, যখন তাঁর বয়স তিন-চার, কাটে কলকাতায় ৫০ নম্বর নেবুতলা লেনে একটা ভাড়াবাড়ির দোতলায় যৌথ পরিবারের ভিড়ের মধ্যে। প্রথমে নওগাঁর স্কুলে এবং পরে কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। ভবানীপুরের মিত্র স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সক্রিয় রাজনীতি করার উদ্দেশে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

কবিতা প্রধান সাহিত্যক্ষেত্র হলেও ছড়া, রিপোর্টাজ, ভ্রমণসাহিত্য, অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনা, অনুবাদ, কবিতাসম্পর্কিত আলোচনা, উপন্যাস, জীবনী, শিশু ও কিশোরসাহিত্য– সব ধরনের রচনাতেই সুভাষ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সম্পাদনা করেছেন বহু গ্রন্থ; বহু দেশি-বিদেশি কবিতা বাংলায় অনুবাদও করেছেন স্বচ্ছন্দে। তাঁর কবিতা চড়া সুরে বাঁধা হলেও সহজবোধ্য; কথ্যরীতিতে রচিত তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ, সংহত আবেগের প্রকাশ ও নিপুণ শিল্পকলার প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৪০-এর দশক থেকে তাঁর অ-রোম্যান্টিক অকপট কাব্যভঙ্গী পরবর্তীকালের কবিদের কাছেও অনুসরণীয় হয়ে ওঠে। সমাজের তৃণমূল স্তরে নেমে গিয়ে সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করে তবেই তিনি কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হতেন। আদর্শ তাঁর কবিতাকে দিয়েছিল অভাবনীয় জনপ্রিয়তা। তবে কবিতার মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনি কবিতাকে রসহীন ও সৌন্দর্যহীন করে ফেলেননি; এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

১৯৪১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সসহ বি এ পাস করে তিনি আশুতোষ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে প্রয়াসী হন কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় পঠনপাঠন বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তিনি শিক্ষকরূপে লাভ করেন কবি কালিদাস রায় ও কালি ও কলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলীকৃষ্ণ বসুকে। ছাত্রজীবনে বন্ধুরূপে পান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, পরিমল সেনগুপ্ত, রমাকৃষ্ণ মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্টজনকে। পরে কর্মজীবনে তাঁর বন্ধুত্ব হয় কবি বিষ্ণু দে, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। কারাজীবনে সঙ্গী হিসেবে পান আব্দুর রাজ্জাক খান, সতীশ পাকড়াশী, উর্দু সাহিত্যিক পারভেজ শহীদী, চারু মজুমদার, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে।

১৯৩৯ সালে লেবার পার্টির সঙ্গে তাঁর সংযোগ হয়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক। পরে ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় লেবার পার্টি ত্যাগ করে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন; '৪২ সালে লাভ করেন পার্টির সদস্যপদ। এ সময় তিনি সদ্যগঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের সাংগঠনিক কমিটিতে কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারপর মাসিক ১৫ টাকা ভাতায় সর্বক্ষণের কর্মীরূপে যোগ দেন পার্টির জনযুদ্ধ পত্রিকায়। ১৯৪৬ সালে তিনি দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে বহু কমিউনিস্টবন্দীর সঙ্গে তিনিও দু'বার কারাবরণ করেন। এসময় তিনি দমদম জেলের অনশন ধর্মঘটে সামিল হন। মুক্তি পান ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে।

মুক্তির পর তাঁর জীবনে দেখা দেয় প্রচণ্ড অর্থকষ্ট। একটি নতুন প্রকাশন সংস্থায় মাত্র ৭৫ টাকা বেতনে সাব-এডিটর নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৫১ সালে সেই চাকরি ত্যাগ করে পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বছরই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন সুলেখিকা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ১৯৫২ সালে সস্ত্রীক কবি বজবজ এলাকার ব্যঞ্জনবেড়িয়া গ্রামের শ্রমিকবস্তির একটি মাটির ঘরে গিয়ে ওঠেন; আত্মনিয়োগ করেন সেই অঞ্চলের চটকল মজুর সংগঠনের কাজে। পরে কলকাতার বন্দর অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজও করেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি থেকে যান পুরনো পার্টিতেই। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হলে ১৪৪ ধারা ভেঙে তিনি দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন। এই দফায় তিনি ১৩দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। মাঝে কিছুকাল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তিনি একযোগে সন্দেশ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

এসময়েই তিনি একে একে লিখে গেছেন অগ্নিকোণ, চিরকুট, কাল মধুমাস, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, ছেলে গেছে বনে, জল সইতে, একটু পা চালিয়ে ভাই প্রভৃতি যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ; হাংরাস, অন্তরীপ, হ্যানসেনের অসুখ বা ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন প্রভৃতি গদ্য রচনা; চিঠি জুড়ে জুড়ে লেখা চিঠির দর্পণে-র মত প্রথাভাঙা উপন্যাস। অনুবাদ করেন নাজিম হিকমত, পাবল নেরুদা, হাফিজ-এর কবিতা, চর্যাপদ ও অমরুশতক ইত্যাদি।

শেষ জীবনে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে তিনি বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর হিমালয়-প্রতিম অবদান অনস্বীকার্য। 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা' বা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক/ আজ বসন্ত' প্রভৃতি অমর পঙ্‌ক্তি আজ বাংলায় প্রবাদতুল্য। যকৃৎ ও হৃদপিণ্ডের অসুস্থতার কারণে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ২০০৩ সালের ৮ জুলাই কলকাতায় তাঁর প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন পালিতা কন্যা রেখে যান।

মোস্তফা কামাল কবি, সংস্কৃতিকর্মী

উপরে

৩ জানুয়ারি, ২০১৮ সন্ধ্যায় শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতসন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন ভারতের শ্রী সপ্তক চট্টোপাধ্যায়

৮ জানুয়ারি, ২০১৮ সন্ধ্যায় শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত 'সংগীত মন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভারতের গায়ক শ্রী প্রবুদ্ধ রাহার সংগীত পরিবেশন ও শ্রী সৌমিত্র সেনগুপ্তর পিয়ানো বাদন

বামে

২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ সন্ধ্যায় শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সংগীতসন্ধ্যা

ডানে

২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ সন্ধ্যায় শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আইজিসিসি আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় ভারতের শ্রীমতী অপলা বসুর রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন

নিচে

২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ হাই কমিশনার কত্থক গুরু মুনমুন আহমেদের পরিচালনায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকার কত্থক শিক্ষার্থীদের অনবদ্য পরিবেশনা উপভোগ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত নৃত্যানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra February 2018

বারিধারার কূটনৈতিক জোনে ভারতীয় হাই কমিশনে নবনির্মিত চ্যাঞ্চেরি ভবন

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka